জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে লন্ডনে
ক্ল্যারিজেস হোটেলের প্রেস কনফারেন্সে বিশ্ব মিডিয়ার মুখোমুখি
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

- "বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত, শোষক আর শোষিত, আমি শোষিতের পক্ষে"
- "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ"
- "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"

– বঙ্গবন্ধু

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

শিল্প ও সংস্কৃতি

দাখিল

অষ্টম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

মঞ্জুর আহমদ

তানজিল ফাতেমা

ড. মো: জাহিদুল কবীর

এগনেস র‍্যাচেল প্যারিস

শেখ নিশাত নাজমী

মো. আশরাফুজ্জামান

মো. হাসান মাসুদ

শাহ্ মোঃ জুলফিকার রহমান

সুলতানা সাদেক

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২৩

শিল্প নির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

চিত্রণ ও প্রচ্ছদ

রাসেল রানা

গ্রাফিক্স

নূর-ই-ইলাহী

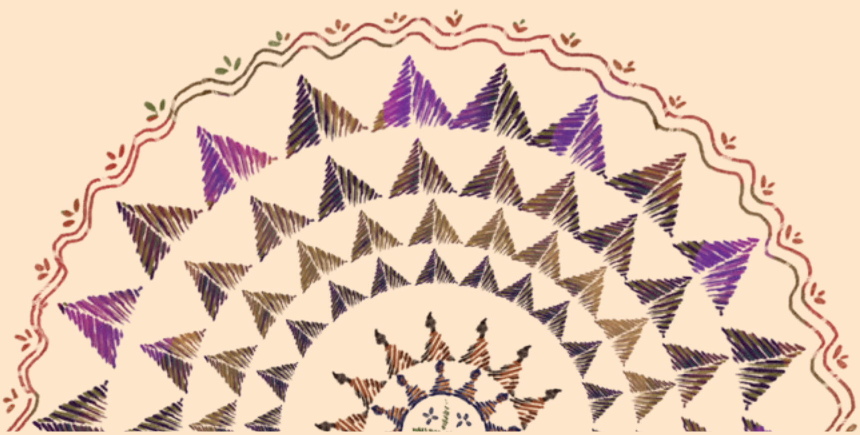

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, পরিমার্জন, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণে কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রিয় শিক্ষার্থী

আমাদের মনের সুন্দর চিন্তাগুলোকে যখন আমরা সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করি তখন তা হয়ে ওঠে শিল্প। আমাদের জীবনযাত্রা, ভাষা, খাবারদাবার, আচার, আচরন, অনুষ্ঠান, পোশাক, শিল্প সব কিছু নিয়ে আমাদের সংস্কৃতি। পৃথিবীর প্রতিটি দেশ ও জাতির রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি। ভুবনজোড়া সংস্কৃতির এই ভিন্ন ভিন্ন রূপের কারণে আমাদের পৃথিবী এত সুন্দর ও বৈচিত্র্যময়।

'শিল্প ও সংস্কৃতি' বিষয়ের মধ্যে দিয়ে আমরা নিজের দেশ ও সংস্কৃতিকে ভালোবাসার পাশাপাশি অন্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব। একই সঙ্গে আমাদের অনুভূতিগুলোকে আঁকা, গড়া, কণ্ঠশীলন, অঙ্গভঙ্গি, লেখাসহ নানা রকমের সৃজনশীল কাজের মধ্য দিয়ে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারব।

পূর্ববর্তী শ্রেণিতে আমরা প্রকৃতি, ঋতুবৈচিত্র্য দেখে ও উপলব্ধি করে সৃজনশীল চর্চা করেছি। আমাদের চারপাশের অভিজ্ঞতা থেকে শিল্পের উপকরন খুঁজে নিয়েছি।

এবার অষ্টম শ্রেণির বইতে অভিজ্ঞতাগুলো সাজানো হয়েছে একটু ভিন্ন ভাবে। বাংলাদেশের একটি বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে পাঁচ শিক্ষার্থী। বন্ধুরা তাদের পঞ্চরত্ন বলে ডাকে। তাদের প্রত্যেকের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ। এ পাঠ্যপুস্তকে আমরা দেখব পঞ্চরত্ন কল্পনায় ভ্রমণ করবে বাংলাদেশের ৮টি বিভাগ। কিন্তু তারা এই বিভাগগুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে বাস্তবে নানা মাধ্যমে। তাই বলা যায় এ ভ্রমণটি হবে কল্পনা ও বাস্তবের মিলিত রূপে। তাদের এই ভ্রমণের সাথে কল্পনায় আমরাও ভ্রমণ করব ।

আবহমান কাল থেকে নদীমাতৃক বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে নদী কেন্দ্রিক বৈচিত্র্যে ভরা সংস্কৃতি। পঞ্চরত্নের সাথে এ ভ্রমণের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে জানব। প্রতি বিভাগে ভ্রমণে আমাদের জানার বিষয়গুলো হবে লোক চিত্রকলা, লোকগান, লোকনাচ, মুক্তিযুদ্ধ, ঐতিহাসিক স্থাপনা ও প্রত্নতাত্তিক নিদর্শন।

যাত্রাপথে আমরা আমাদের আগ্রহ আর পছন্দের ভিত্তিতে আঁকব, গড়ব, নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি, অভিনয় করব। স্থানীয় লোকসংস্কৃতির চর্চা করব। এক্ষেত্রে আমরা সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহার করব।

এ বইতে মোট নয়টি অধ্যায় রয়েছে। এ অধ্যায়গুলোর মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদের সংস্কৃতিকে জানব, চর্চা করব আর দেশকে ভালোবাসব।

সূচিপত্র

কল্পনাতে ভ্রমণ করি নিজের মনে স্বদেশ ঘুরি	১—১০
তিস্তাপারের গল্প	১১—৩০
পদ্মার জলে ঢেউয়ের খেলা	৩১—৪৬
রূপসা তীরের উজান সুরে	৪৭—৫৯
কীর্তনখোলার পাড়ে ধানশালিকের দেশে	৬০—৭২
বুড়িগঙ্গার স্রোতে ভাসাই ভেলা	৭৩—৮৭
কল্পযানে চড়ে ব্রহ্মপুত্র পাড়ে	৮৮—১০০
সুরমা নদীর তীরে	১০১—১০৮
সাম্পানে চড়ে কর্ণফুলীর পাড়ে	১০৯—১১৯

কল্পনাতে ভ্রমন করি নিজের মনে স্বদেশে ঘুরি

বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের অপরূপ সুন্দর একটি উপজেলা হলো তেঁতুলিয়া। উপজেলাটির একটি স্কুলের অষ্টম শ্রেণির পাঁচজন সহপাঠী টিফিনের ফাঁকে তুমুল আলোচনায় মেতেছে। তাদের আলোচনার বিষয় হলো দেশের শিল্প, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধসহ আরোও অনেক কিছু। ফারহানুর রহমান আকাশ, জান্নাতুল ফেরদৌস ইরা, সমীরণ দাস সমীর, রেশমা আক্তার অবনী এবং আব্রাহাম রুজভেল্ট আগুন হলো পাঁচ বন্ধু। এই পাঁচ বন্ধুকে সবাই পঞ্চরত্ন বলে ডাকে। এরা সবাই সপ্তম শ্রেণির পাঠ শেষ করে অষ্টম শ্রেণিতে ক্লাস শুরু করেছে। একই শ্রেণির সহপাঠী হলেও এদের সবার রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ।

ছবি আঁকার খুঁটিনাটি বিষয়ে আগ্রহ রয়েছে আকাশের। ইরার রয়েছে ঐতিহ্য সম্পর্কে জানা ও লেখার, সমীরনের গান ও বাদ্যযন্ত্রে, অবনীর নৃত্য ও অভিনয়ে, আর মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে জানার আগ্রহ রয়েছে আগুনের। আলোচনার এক পর্যায়ে ইরা আবৃত্তি করতে লাগল

সৈয়দ শামসুল হক এর কবিতা

আমি জন্মেছি বাংলায়
আমি বাংলায় কথা বলি।
আমি বাংলার আলপথ দিয়ে, হাজার বছর চলি।
চলি পলিমাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে।
তেরশত নদী শুধায় আমাকে, কোথা থেকে তুমি এলে?
(সংক্ষেপিত)

আবৃত্তি শেষ হবার পরে অবনী বলল, নিজের দেশটার মায়াময় রূপ, ঐতিহ্য আর অপার সমৃদ্ধির নিদর্শনগুলো কবে যে ঘুরে ঘুরে দেখতে পারব! এমন সময় আকাশ তার ব্যাগ থেকে ভাঁজ করা বাংলাদেশের একটি মানচিত্র বের করল। মানচিত্রটি দেখিয়ে আকাশ তার বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলল, গত কয়েকদিন ধরে আমি নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদীকেন্দ্রিক জনপদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছি।

বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের প্রধান প্রধান নদী এবং তাদের ঘিরে গড়ে ওঠা জনপদ ও লোকসংস্কৃতি নিয়ে অনেক কিছু জেনেছি এরই মধ্যে। আমরা সবাই মিলে আনন্দময় ভ্রমণের মধ্য দিয়ে নিজের দেশটা ঘুরে দেখতে পারি ও দেশ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি। আকাশ বলল এটা হবে একটা খেলার মতো যেখানে আমাদের ভ্রমণটা হবে বাস্তব আর কল্পনার মিলিত রূপ। সবাই বলল, সেটা কিভাবে? আকাশ বলল, এর জন্য খুব বেশি কিছুর প্রয়োজন নেই। শুধু দরকার, দেশের ৮টি বিভাগের লোকচিত্রকলা, গান, নাচ, মুক্তিযুদ্ধ, ঐতিহাসিক স্থাপনা ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের তথ্য ও ছবি। সাথে একটা বাংলাদেশের মানচিত্র। প্রতিটি বিভাগের তথ্য হবে বাস্তব আর সে তথ্য ধরে আমরা কল্পনায় সে বিভাগটা ভ্রমণ করব।

আকাশের এই কথায় সবার মধ্যে এক অদ্ভুত ভালোলাগার অনুভূতি তৈরি হলো। সবাই সমস্বরে বলে উঠল অসাধারণ আইডিয়া। সমীর বলল তাহলে আমরা আমাদের এই কল্পনায় স্বদেশ ভ্রমণের একটা নাম রাখি। ইরা বলল আমাদের এই কল্পনায় স্বদেশ ভ্রমণের নাম- ‘কল্পনাতে ভ্রমণ করি, নিজের মনে স্বদেশ ঘুরি’। নামটি সবার খুব পছন্দ হলো, এরই মধ্য দিয়ে শুরু হলো পাঁচ বন্ধুর কল্পনায় স্বদেশ ভ্রমণের কর্মকান্ড।

এই ভ্রমণ শুরু করার আগে সপ্তম শ্রেণির মতো অষ্টম শ্রেণির জন্যও একটা নতুন বন্ধুখাতা তৈরি করতে করে ফেলব। বন্ধুখাতাটি সাথে থাকলে তাতে আমরা নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করে লিখে রাখতে পারব।

অবনী বলল সবকিছুতো হলো এবার বাসার অনুমতিটাতো নিতে হবে। আগুন বলল ভ্রমনটাতো কল্পনায় তার জন্য আবার বাসার অনুমতি কেন? সমীর বলল যেহেতু ভ্রমণটা বাস্তব আর কল্পনা উভয় মিলিয়ে তৈরি তাই।

আকাশ বলল অনুমতির বিষয়ে আমরা শামস মামার সহায়তা নিতে পারি, মামা একবার সবার অভিভাবককে বললে কেউ আর না করবে না। মামাকে যদি আমাদের সাথে যাওয়ার জন্য রাজি করানো যায় তবে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। শামস রহমান হলো অবনীর মামা। যিনি সৃজনশীল তরুণ উদ্যোক্তা হিসেবে নিজ উপজেলায় বেশ পরিচিত। তিনি চারুকলা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করে নিজ এলাকায় একটা সৃজনশীল শিল্পপণ্য তৈরির প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। যেখানে এলাকার অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। সেই প্রতিষ্ঠানে তৈরি পণ্যগুলো দেশের বিভিন্ন স্থানে তো বটেই সাথে বিদেশেও রপ্তানি হয়। সমীর বলল আমরা আজকে ছুটির পরে সবাই মিলে শামস মামার সাথে দেখা করে আমাদের পরিকল্পনার কথা গুলো জানাতে পারি।

এরই মধ্যে টিফিনের শেষে পরবর্তী ক্লাসের ঘণ্টা বাজল। রুটিন অনুসারে শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ের শিক্ষক ক্লাসে ঢুকলেন। সাথে সাথে সমস্ত ক্লাস জুড়ে একটা আনন্দময় অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল। শিল্প ও সংস্কৃতি ক্লাসে এই আনন্দ নতুন কিছু জানার আনন্দ, নতুন কিছু সৃষ্টি করার আনন্দ। শিক্ষক সবার সাথে কুশল বিনিময়ের পরে বললেন আজকের ক্লাসে আমরা ছবি আঁকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিপ্রেক্ষিত (perspective) সম্পর্কে জানব। নতুন এই বিষয়ে জানার জন্য সবাই বেশ আগ্রহী হয়ে শিক্ষকের কথাগুলো শুনছিল।

এমন সময় শিক্ষক খেয়াল করলেন, সমীর উদাস হয়ে জানালা দিয়ে বাইরে মাঠের দিকে তাকিয়ে আছে। শীতটা এখনোও শেষ হয়ে যায়নি, এই দুপুরবেলাতেও প্রকৃতিতে হালকা কুয়াশা রয়েছে। যার ফলে দূরের জিনিসগুলোকে কিছুটা ঝাপসা মনে হচ্ছে। শিক্ষক সমীরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কি হয়েছে সমীর?

সমীর শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা স্যার, মাঠের দুপাশের গোলপোস্ট দুটি একই মাপের, কিন্তু কাছেরটিকে বড় আর দূরেরটিকে ছোট এবং ঝাপসা মনে হচ্ছে, কেন? শিক্ষক হেসে বললেন, দৃষ্টিভ্রমের কারণে এমন হয়। যেমন রেললাইনের দিকে তাকালে মনে হয় দুপাশের লাইন দূরে গিয়ে একটি বিন্দুতে মিলে গেছে, বিষয়টি ঠিক তেমন। মজার বিষয় হলো আজকের শিল্প ও সংস্কৃতি ক্লাসের পাঠের বিষয়টি তোমার ভাবনার সাথে মিলে গেছে। তাহলে চলো এবার আমরা ছবি আঁকার পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি।

এই পাঠে আমরা বিভিন্ন ছবি আর বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ছবি আঁকার পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে জানব।

কাছের জিনিস বড় আর স্পষ্ট আর দূরের জিনিস ছোট আর ঝাপসা এই বিষয়টি ছবিতে ফুটিয়ে তোলার পদ্ধতিকে ছবি আঁকার পরিপ্রেক্ষিত বলে।

চতুর্দশ শতাব্দির প্রথম দিকে ইতালীয় রেনেসাঁর শিল্পীরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে তাদের শিল্পকর্মে পরিপ্রেক্ষিতের প্রথম সঠিক প্রয়োগ ঘটান। রেনেসাঁর যুগে সঠিকভাবে পরিপ্রেক্ষিতের প্রয়োগ পৃথিবীর শিল্পকলার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী আবিষ্কার।

ছবি আঁকায় দু'ধরনের পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহার হয়- রৈখিক (linear), বায়বীয় (arial)।

রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত

রেখার সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা পরিপ্রেক্ষিতকে রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত বলে। এই পদ্ধতিতে চিত্রে কাছের বস্তুটি বড় আর দূরের বস্তুটিকে তুলনামূলক ছোট করে আঁকা হয়। এইভাবে চিত্রে দূরত্ব, গভীরতা ইত্যাদিকে ফুটিয়ে তোলা হয়।

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইতালীয় রেনেসাঁর বিখ্যাত স্থপতি, শিল্পী ফিলিপ্পো ব্রুনেলেসচি নানাবিধ গবেষণার মধ্যদিয়ে প্রথম রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে নির্ভুল ধারনা দেন।

রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত

বায়বীয় পরিপ্রেক্ষিত

রঙের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা পরিপ্রেক্ষিতকে বায়বীয় পরিপ্রেক্ষিত বলে। এই পদ্ধতিতে ছবিতে কাছের বস্তুটির রঙ গাঢ় এবং স্পষ্ট এবং দূরের দূরের বস্তুটির রঙ ক্রমশ হালকা এবং অস্পষ্ট করে আঁকা হয়। এইভাবে চিত্রে দূরত্ব, গভীরতা ইত্যাদিকে ফুটিয়ে তোলা হয়।

ইতালীয় রেনেসাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি প্রথম বায়বীয় পরিপ্রেক্ষিতের সঠিক বর্ণনা প্রদান করেন এবং তার অমর শিল্পকর্মগুলোতে এই পদ্ধতির সঠিকভাবে ব্যবহার করেন।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

বায়বীয় পরিপ্রেক্ষিত

পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে যেভাবে আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতা পেতে পারি

পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতার জন্য আমরা একটি দলীয় কাজ করতে পারি। প্রথমে সমান উচ্চতার পাঁচজন সহপাঠী নিয়ে আমরা একটা দল গঠন করব। দলের সবার হাতে একই রঙের সমান সাইজের একটি করে কাগজ দেবো। কাগজগুলো নিয়ে দলের প্রত্যেকে বিদ্যালয়ের বারান্দা অথবা স্কুল মাঠের একপ্রান্তে থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত সমান দূরত্বে একই ভঙ্গিতে দাঁড়াব। এবার আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে দেখলে কাছে দাঁড়ানো বন্ধুটিকে দেখতে সবচেয়ে বড় মনে হবে সাথে তার হাতের কাগজটিও বড় এবং গাঢ় রঙের মনে হবে। আমাদের থেকে ক্রমশ দূরে দাঁড়ানো বন্ধুদের এবং তাদের হাতের কাগজটি ছোট মনে হবে সাথে সাথে রংটি হালকা মনে হবে। নিচের প্রথম ছবিটা দেখে আমরা পরিপ্রেক্ষিতের সাহায্যে দূরত্বের বিষয়টি কিভাবে বুঝানো হয় তার কিছুটা অভিজ্ঞতা পেতে পারি।

পরিপ্রেক্ষিতের সাথে সাথে এবার আমরা ছবি আঁকার এমন একটি মাধ্যম সম্পর্কে জানব যা আমাদের সকলের কাছে খুব পরিচিত, তাহলো পেনসিল। উপরোক্ত পাঠে পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে যা কিছু জানলাম সে অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে শুধু পেনসিলের মাধ্যমে আমরা ছবি আঁকতে পারি। তাহলে এবার আমরা পেনসিল স্কেচ সম্পর্কে একটু জানার চেষ্টা করি।

এবার আমরা পেনসিল স্কেচ সম্পর্কে জানব এবং পরিপ্রেক্ষিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ছবি আঁকা অনুশীলন করব।

পেনসিল স্কেচ

স্কেচ অর্থ খসড়া, সে অর্থে পেনসিলে আঁকা খসড়া ছবিকে পেনসিল স্কেচ বলে। পেনসিল স্কেচের জন্য অনেক রকমের পেনসিল ব্যবহার করা হয়। পেনসিলে এর শিষ তৈরি করা হয় গ্রাফাইট দিয়ে। পেনসিলের গ্রাফাইটের পার্থক্য পেনসিলের গায়ে 'H', 'B', 'HB' দিয়ে লিখা থাকে। পেনসিলের গায়ে লিখা 'H' অক্ষরটি দিয়ে শক্ত (hard) বুঝানো হয়। 'B' অক্ষরটি দিয়ে বুঝানো হয় কালো (black)। 'HB' অক্ষরটি দিয়ে বুঝানো হয় শক্ত এবং কালো (hard black) উভয় বৈশিষ্ট্যের মাঝামাঝি। গ্রাফাইট যত নরম (soft) হয় এর মাধ্যমে প্রয়োগ করা রেখাটিও ততই গাঢ় এবং কালো হয়। হালকা থেকে পর্যায়ক্রমে গাঢ় আস্তর দিয়ে পেনসিল ঘষে ঘষে নানা মাত্রায় আলোছায়া নির্ণয় করা যায়। আলোছায়া নির্ণয়ক এই আস্তরকে টোন (tone) বলা হয়।

আর নানা রকমের টোনের সাহায্যে করা হয় পেনসিল স্কেচ।

পেনসিল স্কেচের ক্ষেত্রে HB, 2B, 4B, 6B এই সকল পেন্সিল বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে। তাছাড়া চারকোল এবং বিভিন্ন রঙের রং পেনসিলের সাহায্যে আমরা স্কেচ তৈরি করি।

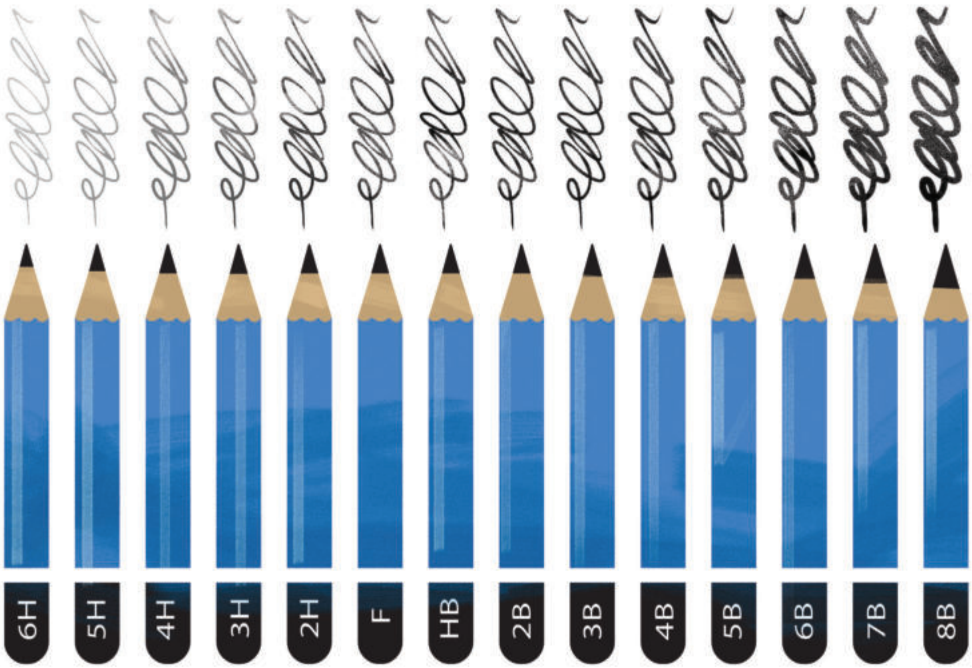

ছবিতে পেনসিলের হালকা টোন (light tone) দিয়ে আলো আর গাঢ় টোন (dark tone) দিয়ে অন্ধকার বুঝানো হয়। হালকা এবং গাঢ় টোনের মাঝামাঝি টোনটি হলো মধ্য টোন (middle tone) । পেনসিল স্কেচ হলো ছবি আঁকার সবচেয়ে সহজ ও কার্যকরী মাধ্যমগুলোর অন্যতম।

কাগজে নিচের ছবির মতো করে ছক এঁকে তাতে পেনসিল দিয়ে হাতের চাপ ধীরে ধীরে কম থেকে বেশি করে টোন হালকা থেকে গাঢ় করা যায়। তাছাড়া একটি টোনের উপর কয়েকবার টোন দিয়েও হালকা থেকে গাঢ় টোন তৈরি করা যায়। এইভাবে হাতের কাছে পাওয়া যেকোনো পেনসিল, কলম, চারকোল (কাঠ কয়লা), রংপেনসিল, ইত্যাদির সাহায্যে টোন দিয়ে ছবি আঁকা যায়।

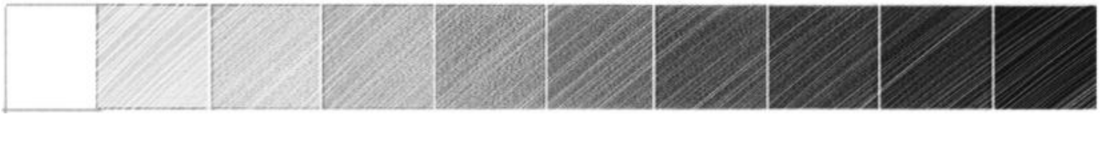

হালকা থেকে গাঢ় পেনসিলের টোন অনুশীলন করব

পেনসিল মাধ্যমে ত্রিমাত্রিক বস্তু

নিচের ছবিগুলো দেখে আমরা পেনসিল স্কেচ অনুশীলন করব। পরিপ্রেক্ষিত জ্ঞানকে কাজে লাগাব। সাথে আলো আর অন্ধকারকে ফুটিয়ে তুলে ছবিকে বাস্তবসম্মত করার চেষ্টা করব।

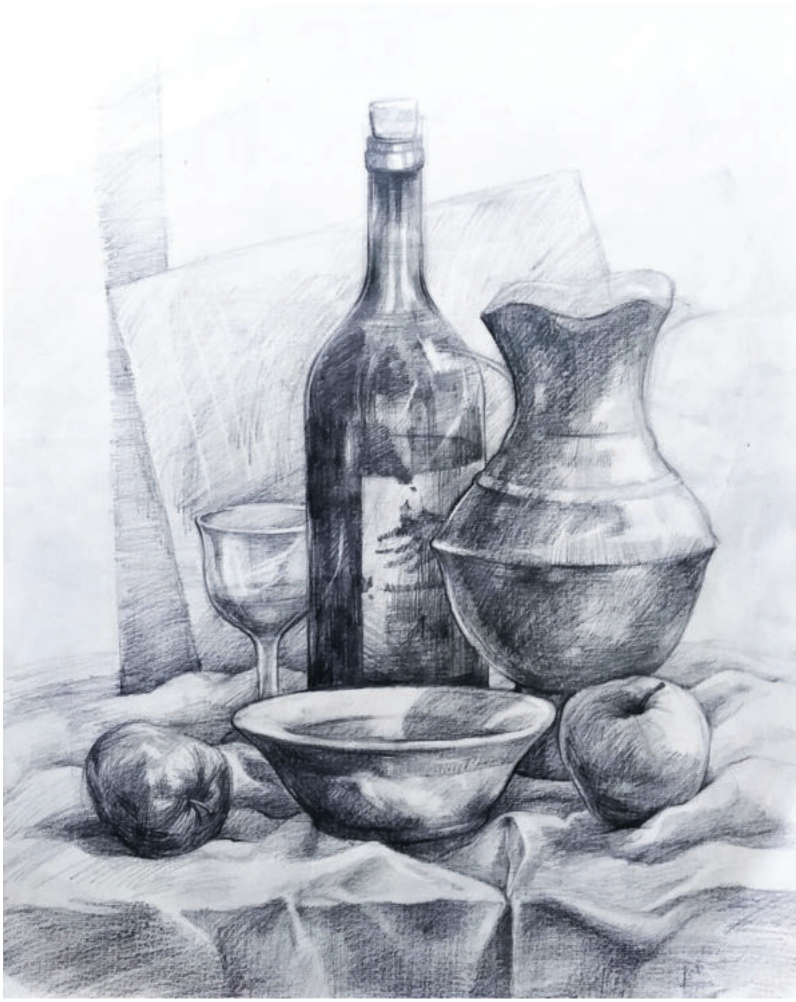

পেনসিল মাধ্যমে জড় জীবন (Still life)

পেনসিল মাধ্যমে নিসর্গ (Land scape)

পেনসিলের সাহায্যে হালকা থেকে গাঢ় টোন অনুশীলন করব

এই অধ্যায়ে আমরা যা করব

- অষ্টম শ্রেণির জন্য বন্ধুখাতা তৈরি করব।
- দলগত কাজ ও বইয়ে দেওয়া ছবি দেখে এবং বুঝে পরিপ্রেক্ষিত অনুশীলন করব।
- পেন্সিল স্কেচ সম্পর্কে জানব এবং সহজলভ্য যেকোনো ধরনের পেনসিল, কলম, চারকোল (কাঠ কয়লা), রং পেনসিল দিয়ে টোন অনুশীলন করব।
- পেনসিলের সাহায্যে ত্রিমাত্রিক বস্তু, জড় জীবন ও প্রকৃতি আঁকা অনুশীলন করব।

ছুটির পরে পঞ্চরত্ন শামস মামার প্রতিষ্ঠান সৃজন ভুবনে এসে উপস্থিত হলো। পঞ্চরত্নকে একসাথে দেখে মামার আর বুঝতে বাকি রইলো না তারা কোনো একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। মামা বলল কিরে তোদের উদ্দেশ্য কি তাড়াতাড়ি বলে ফেল। আকাশ তাদের সব পরিকল্পনার কথা মামাকে জানাল। মামা বললেন পরিকল্পনাটিতো চমৎকার আর আমিও না হয় আগামী সপ্তাহে কয়েকটা দিন ছুটির ব্যবস্থা করে নিলাম। কিন্তু সবার আগে তোমাদের অভিভাবকদের অনুমতি নিতে হবে। ঠিক আছে আমি আজ সন্ধ্যায় বাসায় ফেরার আগে প্রত্যেকের বাসায় গিয়ে তোমাদের বাবা মার সাথে কথা বলে নেবো।

তিস্তাপারের গল্প

নানান রঙের শতরঞ্জি

হরেক রকম গান

লোকশিল্প, লোকনৃত্য

তিস্তাপারের প্রাণ।

অবশেষে চলে এলো সে প্রতীক্ষিত কল্পনায় স্বদেশ ভ্রমণের দিন। শীতের কুয়াশার চাদর সরিয়ে ভোরের রাঙা সূর্যটা উঁকি দিচ্ছে পুব আকাশে। সবাইকে সুপ্রভাত জানিয়ে অবনী দেখে নিল সবাই প্রয়োজনীয় সব কিছু ঠিকমতো নিয়েছে কিনা। আকাশ ভ্রমণ নির্দেশনা সম্বলিত একটি ম্যাপ বের করল। এর মধ্যে শামস মামা একটা ভ্যান নিয়ে উপস্থিত হলো। মামা সবার উদ্দেশ্যে বলল ভারসাম্য (balance) ঠিক রেখে ভ্যানে বসে পড়। মামা দেখতে পেল ভারসাম্য ঠিক হয়নি। একপাশে চারজন অন্য পাশে দুজন হয়েছে। তিনি বললেন ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য অনুপাত (proportion) সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি। আকাশ বলল মামা ভারসাম্য ও অনুপাতের বিষয়টি একটু বুঝিয়ে বলো। মামা বলল সমীর, অবনী আর আকাশ ভ্যানের ডান পাশে বসো। আমি, ইরা আর আগুন বাম পাশে বসি তারপর তোমাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। অনুপাত মানে হলো তুলনা, একই রকমের

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

দুটি রাশির বা বস্তুর মধ্যে তুলনাকে অনুপাত বলে। উপাদানের সঠিক ও সমান অনুপাতকে ভারসাম্য বলে। মামা বলল এবার তোমাদের একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা দিই।

এই ভ্যানটা তিন চাকার যান, এর ডান এবং বাম পাশে দুটি এবং সামনে একটি চাকা আছে। সামনের চাকাটি দিক নির্দেশনা ঠিক রাখে আর পেছনের চাকাগুলো মূল ওজন বহন করে। ফলে উভয় চাকার উপর সমান অনুপাতের ওজন হওয়া জরুরি। তাই আমরা মোটামুটি সমান সাইজ ও ওজনের তিনজন করে উভয় দিকে বসলাম তাতে ভারসাম্য ঠিক হলো। এবার ভ্যানটি চালাতে সুবিধা হবে।

এই বাস্তব অভিজ্ঞতার মতো ছবি আঁকার ক্ষেত্রেও অনুপাত ও ভারসাম্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ছবি আঁকায় অনুপাত হলো ছবিতে ব্যবহৃত আকার-আকৃতি, রং, পরিসর, বুনটসহ ইত্যাদি উপাদানের মধ্যকার তুলনা।

এই সকল উপাদানের সমান ও সঠিক ব্যবহারকে বলে ছবি আঁকার ভারসাম্য।

ছবি আঁকায় দু'ধরনের ভারসাম্যের ব্যবহার বেশি দেখা যায়। যেমন- প্রতিসম ভারসাম্য (symmetrical balance) ও অপ্রতিসম ভারসাম্য (asymmetrical balance) ।

প্রতিসম ভারসাম্য

যার উভয় দিকের অনুপাত সমান।

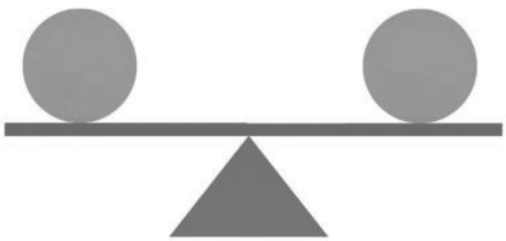

প্রতিসম ভারসাম্য

অপ্রতিসম ভারসাম্য

যার উভয় দিকের অনুপাত সমান থাকে না। ভারসাম্য সম্পর্কে আমরা পরে আরও জানব।

অপ্রতিসম ভারসাম্য

নকশার ক্ষেত্রে প্রতিসম ভারসাম্য আর চিত্র রচনার ক্ষেত্রে অপ্রতিসম ভারসাম্যের ব্যবহার বেশি দেখা যায়।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

মামা বলল তবে চল তোমাদেরকে এঁকে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি।

ছবি আঁকার ক্ষেত্রে প্রতিসম ভারসাম্য

ছবি আঁকার ক্ষেত্রে অপ্রতিসম ভারসাম্য

এই সকল আলোচনা করতে করতে ভ্যানটি বাস স্টেশনে এসে থামল। তাদের এবারের গন্তব্য পঞ্চগড় হয়ে রংপুর।

রংপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, পঞ্চগড় এই ৮টি জেলা নিয়ে রংপুর বিভাগ গঠিত। তিস্তা এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ নদী। শতরঞ্জি, ভাওয়াইয়া গান আর সাঁওতাল নাচ এই বিভাগের লোকসংস্কৃতিকে করেছে সমৃদ্ধ।

এর মধ্যে বাস রংপুর এসে পৌঁছাল। বাস থেকে নেমে মামা এক ব্যক্তিকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাত মেলাল। তিনি বাস স্টেশনে আমাদের সবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। মামা সবাইকে জানালেন ইনি আমার বন্ধু রাইসুল ইসলাম। সবাই রাইসুল মামাকে সালাম আর অভিবাদন জানাল। শামস মামা বললেন আমরা একসাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি। আমি পড়েছি চারুকলা বিভাগে আর রাইসুল পড়েছে সংগীত বিভাগে। দুটি আলাদা বিভাগের ছাত্র হলেও আমরা সবসময় একসাথে নতুন কিছু করার স্বপ্ন দেখতাম। এর মধ্যে রাইসুল মামা বললেন তোমরা নিশ্চয়ই পঞ্চরত্ন। তোমাদের কথা আমি শামসের কাছ থেকে শুনেছি। এখন প্রথমে সবাই আমাদের বাড়িতে যাব সেখানে দুপুরের খাবার খেয়ে যাব নিসবেতগঞ্জ বা শতরঞ্জি গ্রামে।

দুপুরের খাবার টেবিলে রাইসুল মামা বললেন আজকে তোমাদের রংপুরের তিনটি ঐতিহ্যবাহী খাবারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। প্রথমটি হলো পাটশাক ও খাবার সোডা দিয়ে রান্না করা 'শোলকা', দ্বিতীয়টি হলো নাপা শাক দিয়ে রান্না করা 'প্যালকা', আর শেষেরটি হলো ছোট মাছের শুকনো শুঁটকি আর কচুর ডাটা দিয়ে তৈরি 'সিঁদল'। গরম ভাতের সাথে এই তিন ঐতিহ্যবাহী খাবার খেয়ে পঞ্চরত্ন অভিভূত হয়ে গেল। খাবারের ফাঁকে শামস মামা বললেন ঐতিহ্যবাহী স্থানীয় খাবার হলো নিজস্ব সংস্কৃতির রূপ। এসব ঐতিহ্যবাহী খাবার না খেলে স্থানীয় সংস্কৃতিকে জানাটাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

খাবার শেষে রাইসুল মামার নেতৃত্বে সবাই বেরিয়ে পড়ল শতরঞ্জি গ্রামের উদ্দেশ্যে।

শতরঞ্জি গ্রাম

রংপুর শহরের উপকণ্ঠে ঘাঘট নদীর তীরে অবস্থিত নিসবেতগঞ্জ। এই অঞ্চলে হস্তশিল্পজাত পণ্য হিসেবে শতরঞ্জি তৈরি হয়। ঐতিহ্যবাহী পণ্য হিসেবে এর রয়েছে কয়েক শত বছরের গৌরব গাঁথা। বর্তমানে বাংলাদেশের একটি ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য বা Geographical Indication (GI) হিসেবে যা স্বীকৃতি পেয়েছে অর্থাৎ এটি যে আমাদের নিজস্ব পণ্য তার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে।

পূর্বে এই এলাকার নাম ছিল পীরপুর। ১৮৩০ সালে এক ব্রিটিশ কালেক্টর মিস্টার নিসবেত এই পীরপুর এলাকায় এসে শতরঞ্জি দেখে মুগ্ধ হন। তিনি শতরঞ্জির উন্নয়ন ও প্রচারে ব্যাপক অবদান রাখেন। পরে তাঁর সম্মানে এই এলাকাটির নামকরণ করা হয় নিসবেতগঞ্জ। শতরঞ্জি সম্পর্কে এসব কথাগুলো বলছিলেন রাইসুল মামা।

শতরঞ্জি পৃথিবীর প্রাচীনতম বুনন শিল্পের মধ্যে অন্যতম। শতরঞ্জি তৈরি হয় ঐতিহ্যবাহী বুনন পদ্ধতিতে। এর মধ্যে আমরা একটা শতরঞ্জি কারখানায় প্রবেশ করলাম। শতরঞ্জি তৈরি হয় পিট লুম বা গর্ত তাঁতে।

মাটিতে একটা গর্ত তৈরি করে তাতে পা ঢুকিয়ে বুনন শিল্পীরা বসেন। তাঁতের প্যাডেলগুলো মাটির নিচে তাদের পায়ের কাছে থাকে। মাটির সমতলের কিছুটা উপরে তাঁতের কাঠামোটা শক্তভাবে মাটির সাথে পোঁতা থাকে। কাঠামোতে আটকানো টানাগুলো রশি দিয়ে দেওয়া হয়। প্রতি ইঞ্চিতে মোট আটটি করে রশি টানা থাকে। নকশা অনুযায়ী বিভিন্ন রঙের সুতা হাতে গুনে আড়াআড়িভাবে পার করা হয়। এভাবেই জ্যামিতিক বিন্যাসে নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। এভাবে নির্দিষ্ট মাপ সম্পন্ন হলে তা তাঁত থেকে কেটে নেওয়া হয়। এসব শতরঞ্জি বিভিন্ন সাইজের হয়ে থাকে।

পিটলুম বা গর্ত তাঁত

শতরঞ্জির নকশায় ব্যবহারিত মোটিফ অনুযায়ী তাকে ঐতিহ্যবাহী নকশা আর আধুনিক নকশা দুই ভাগে ভাগ করা যায়। মোটিফ হল নকশার একটি একক। যা একটি প্যাটার্ন তৈরি করতে পুনরাবৃত্তিকভাবে ব্যবহার করা হয়। ঐতিহ্যবাহী নকশায়- জাফরি, নারীর মুখ, হাতির পা, রাজা-রানী, নাটাই, প্রজাপতি, ঘুড়ি, বাঘবন্দি, পালকি, রাখালবালক, কলসি কাঁখে রমণী, মোড়া ফুল, জামরুল পাতা, রথ পাড়ি, দাবারঘর, পৌরাণিক চরিত্র, নবান্ন, পৌষপার্বণ, প্রাকৃতিক দৃশ্যসহ নানা মোটিফ দেখা যায়।

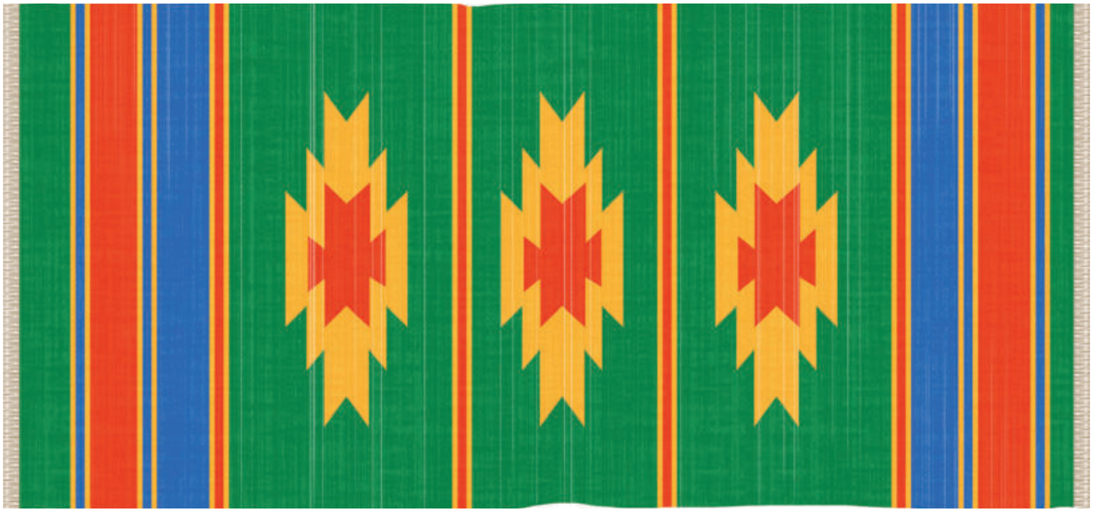

শতরঞ্জি

শতরঞ্জি মোটিফ

আধুনিক নকশায়- কাবাঘর, মসজিদ, মিনার, পুষ্পিতপাতা, পানপাতা, বুটিদার জরি ও তেরছি নকশা, মাছ, পাখি, নৌকা, গ্রামের দৃশ্য, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি ধরনের মোটিফ দেখা যায়।

আগের দিনে শতরঞ্জি তৈরিতে পাটের সুতা ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে বিভিন্ন রকমের সুতা ব্যবহার করা

হয়। উজ্জ্বল রঙের সুতার ব্যবহারের কারণে বর্তমানের শতরঞ্জি অনেক বেশি বর্ণিল। এসব শতরঞ্জি বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে যার ফলে অর্জিত হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা। এর মাধ্যমেই দেশীয় শিল্প কীভাবে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে তা শামস মামা জানাল। এভাবে আমাদের সবাইকে ভাবতে হবে কি করে নিজেদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো যায়। সেই সাথে খুঁজে বের করতে হবে দেশের সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মধ্যদিয়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করার পথ। সবকিছু দেখে শুনে পঞ্চরত্নের কাছে মনে হচ্ছিল তারা যেন কোনো স্বপ্নপুরীতে আছে। শতরঞ্জি কারখানার সকল বুনন শিল্পীকে বিদায় জানিয়ে সেদিনের মতো তারা বাড়ি ফিরে আসল। শামস মামা বললেন নকশা করার পদ্ধতি সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য এবার তোমাদের কিছু অনুশীলন করাব।

এই পাঠে শতরঞ্জির বিভিন্ন মোটিফ দিয়ে ছক আঁকা কাগজে নকশা অনুশীলন করব। নকশা বড় করা ও স্থানান্তর করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানব।

উপরের ছবিতে দেওয়া শতরঞ্জির মোটিফগুলোর উপরে এক সেন্টিমিটার করে ছক এঁকে নেবো। সে মাপ অনুযায়ী সাদা কাগজে ছক এঁকে তাতে মোটিফটি হুবহু আঁকার চেষ্টা করব। এরপর মোটিফটি কাগজের ডান পাশে উলটো ভাবে এঁকে খুব সহজে নতুন নকশা তৈরি করা যাবে। মোটিফগুলোতে বিপরীতভাবে রঙের ব্যবহার করে একটা খসড়া নকশা তৈরি করব। এই অনুশীলনের জন্য আমরা পেনসিল, রংপেনসিল, বিভিন্ন রঙের কলমসহ সহজলভ্য যেকোনো রকমের রং ব্যবহার করতে পারি। কাজটি বুঝার জন্য আমরা নিচে দেয়া ছবিগুলো দেখতে পারি।

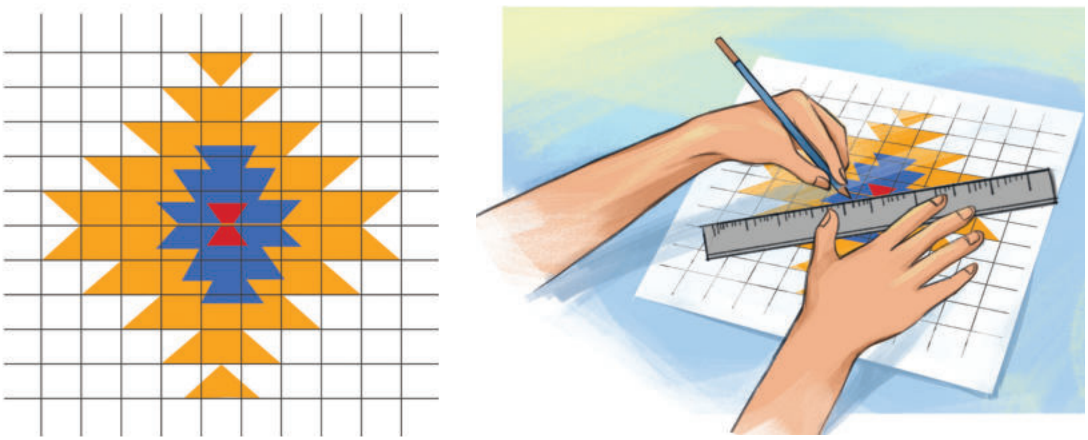

গ্রাফ কাগজে শতরঞ্জির মোটিফ অনুশীলন

মামা বলেন এবার তোমাদের জানাব খসড়া নকশাটা কিভাবে প্রয়োজনমতো আনুপাতিক হারে বড় করা যায়। এবং তা কাগজ থেকে কাপড়সহ প্রয়োজনীয় উপকরণের উপর স্থানান্তর করা যায়।

ছোট মোটিফ বা নকশা বড় করে আঁকার পদ্ধতি

- খসড়া নকশাটির উপর এক সেন্টিমিটার করে ছক এঁকে নিতে হবে।
- যে অনুপাতে খসড়া নকশাটা বড় করা প্রয়োজন সে অনুপাতে কাগজ অথবা যে উপকরণের উপর বড়

করে আঁকতে হবে তাতে ছক এঁকে নিবো। যেমন-নকশার উপরে আঁকা এক সেন্টিমিটারের ছকটিকে প্রয়োজনমতো উপকরণের উপর এক ইঞ্চি থেকে এক ফুটের ছক এঁকে তাতে নকশাটা বড় করে আঁকতে হবে।

- এভাবে তোমরা যেকোনো নকশাকে যতটুকু ইচ্ছা বড় করতে পার।

কাগজে আঁকা নকশা কিভাবে কাপড়সহ অন্যান্য উপকরণে স্থানান্তর করা যায়

- খসড়া নকশাটির উপর ট্রেসিং পেপার বসিয়ে তাতে নকশাটি এঁকে নেবো। আমরা কি জানি ট্রেসিং পেপার কি? ট্রেসিং পেপার হলো একধরনের স্বচ্ছ কাগজ যা কোনো ছবিকে ছাপ দিয়ে আঁকার জন্য ব্যবহৃত হয়। ট্রেসিং পেপার পাওয়া না গেলে সাদা কাগজে হালকা নারিকেল তেল ঘষে নিজেদের মতো করে ট্রেসিং পেপার বানিয়ে নিতে পারি।
- ট্রেসিং পেপারে আঁকা রেখা ধরে কিছুটা পর পর সুচ দিয়ে ছিদ্র করে নেবো।
- এবার নির্দিষ্ট কাপড় আথবা যে উপকরণের উপর আমরা খসড়া নকশাটা স্থানান্তর করতে চাই তার সঠিক স্থানে ট্রেসিং পেপারটা আটকে তার ছিদ্রগুলোর উপর কাপড়ে ব্যবহার করা গুঁড়া নীল দিয়ে হাল্কাভাবে ঘষতে হবে। এভাবে ঘষার ফলে দেখা যাবে ছিদ্রগুলো দিয়ে নীলের গুঁড়াগুলো কাপড়ে গিয়ে লাগছে এবং ট্রেসিং পেপারে আঁকা নকশাটি বিন্দু বিন্দু নীল রঙে কাপড় বা প্রয়োজনীয় উপকরণে ফুটে উঠেছে।
- এভাবে কাপড়সহ যেকোনো উপকরণের উপর নকশা স্থানান্তর করে নিজেদের ইচ্ছামতো নতুন পণ্য তৈরি করা যায়।

শতরঞ্জির মোটিফে নতুন পণ্যের নকশা

শতরঞ্জির বুনন, নকশা তৈরি নিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে শামস মামা বললেন শোনো তোমাদেরকে আজ এমন একজন শিল্পীর কথা বলব যিনি তাপিশ্রী (tapestry) নামক বুনন শিল্পকে এক অনন্য শিল্পমাধ্যম হিসেবে আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি হলেন শিল্পী রশীদ চৌধুরী।

শিল্পী রশীদ চৌধুরী

বাংলাদেশের আধুনিক শিল্প-আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ শিল্পী রশীদ চৌধুরী ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১লা এপ্রিল ফরিদপুর জেলার রতনদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন চিত্রশিল্পী, লেখক, ভাস্কর, শিক্ষক ও সংগঠক। তিনি ১৯৪৯ সালে ঢাকা সরকারি আর্ট কলেজে ভর্তি হয়ে ১৯৫৪ সালে শিক্ষা সম্পন্ন করেন। এরপর ১৯৫৬ সালে এক বছরের বৃত্তি লাভ করে স্পেনের মাদ্রিদে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৬০ সালে তিনি চার বছরের বৃত্তি লাভ করে ফ্রান্সের প্যারিসের ফ্রেস্কো, ভাস্কর্য ও তাপিশ্রী বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি এই সময়ে বিখ্যাত শিল্পী জঁ ওজাম্-এর অধীনে শিক্ষা গ্রহণ করেন। মার্কিন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত লিডারশিপ গ্র্যান্ট পুরস্কারে ভূষিত হয়ে ১৯৭৫ সালে শিক্ষাসফরে যুক্তরাষ্ট্রে যান।

১৯৬৯ সালে শিল্পী রশীদ চৌধুরীর প্রচেষ্টায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। এছাড়া, ১৯৭৩ সালে চট্টগ্রাম সরকারি চারুকলা কলেজ প্রতিষ্ঠায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন প্রবর্তিত পথ ধরে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পচর্চার জন্য শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টিতে শিল্পী রশীদ চৌধুরীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দেশের লোক সংস্কৃতির বিষয়সমূহ তাঁর শিল্পকর্মে ফুটে উঠেছে উজ্জ্বল রঙে। ইসলামি ক্যালিগ্রাফির নান্দনিক প্রভাবও তাঁর শিল্পকর্মে দেখা যায়। তিনি চিত্ররচনা করেছেন তেলরঙে, টেম্পারা, গোয়াশে এবং জলরঙে। এছাড়া, পোড়ামাটিতে ভাস্কর্য, ফ্রেস্কো ও বিভিন্ন মাধ্যমে ছাপাই চিত্র করেছেন। তিনি পাট-রেশমের সমাহারে তাপিশ্রী (tapestry) বুনন শিল্পমাধ্যমে নির্মাণ করেছেন তার উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্ম। শিল্পের এই মাধ্যমে তিনি সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম শিল্পী হিসেবে বিবেচিত।

দেশ বিদেশের সরকারি ভবন ও দপ্তরে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিল্পী রশীদ চৌধুরীর তাপিশ্রী (বুনন শিল্প) সংগ্রহে আছে। তাপিশ্রী শিল্পে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৭৭ সালে তিনি একুশে পদক এবং ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

শিল্পী রশীদ চৌধুরীর কিছু শিল্পকর্ম

কম্পোজিশান- ১১, মাধ্যম- তাপিশ্রী, ১৯৮০

কম্পোজিশান- ১, মাধ্যম- তাপিশ্রী, ১৯৭৯

কম্পোজিশান- ৩, মাধ্যম- তাপিশ্রী, ১৯৭৯

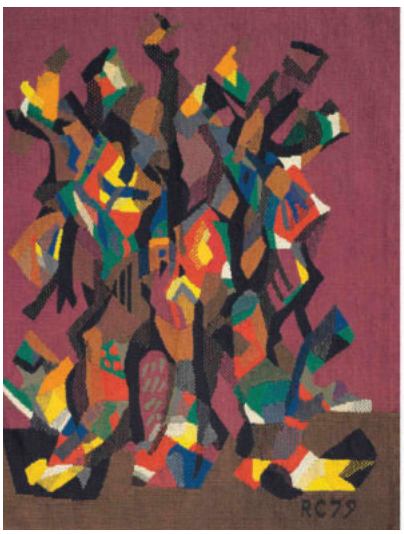

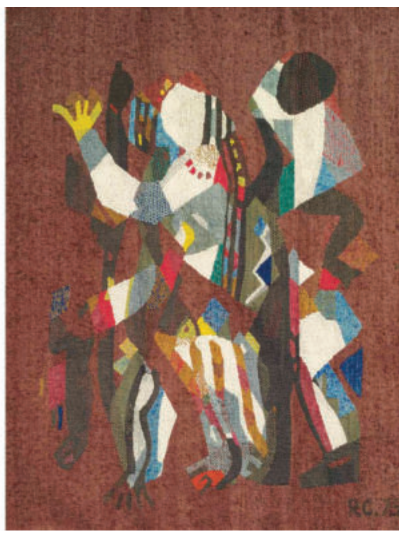

শিরোনামহীন, মাধ্যম- তাপিশ্রী, ১৯৭৯, ১৯৮৪, ১৯৭৫

আলোচনা শেষে রাতের খাবারের পরে বসল প্রসিদ্ধ ভাওয়াইয়া শিল্পী রাইসুল মামার গানের আসর। প্রথমে তিনি ভাওয়াইয়া গান সম্পর্কে জানালেন–হিমালয়ের পাদদেশে উত্তরবঙ্গের মায়াবী জনপদের গান হলো ভাওয়াইয়া। তিস্তা, ধরলা, তোরষা, মনসা নদীবিধৌত অঞ্চলে এ গানের সবচেয়ে বেশি চর্চা হতে দেখা যায়। বাংলাদেশের উত্তরাংশের জেলা রংপুর ও দিনাজপুর জুড়েই ভাওয়াইয়া গানের উর্বর ভূমি। মূলত 'ভাও' অর্থাৎ ভাব এবং সংস্কৃত শব্দ 'আওয়াই' অর্থ জনরব শব্দ দুটি থেকেই ভাওয়াইয়া গানের নামকরণ হয়েছে। এ অঞ্চলের রাজবংশী নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যেও 'ভাও' শব্দটির প্রচলন রয়েছে। ভাওয়াইয়া ছাড়াও এ অঞ্চলে মেয়েলি গীত, যোগীর গান, পালা বা কাহিনি গান, জারি গান, গোয়ালির গান বেশ জনপ্রিয়।

তরাই অঞ্চলে প্রচুর মহিষের বাথান দেখা যায়। তরাই হলো দুই পাহাড়ের মাঝখানে অবস্থিত সমতল ভূমি আর মহিষের বাথান হলো মহিষের চারণভূমি। যেখানে মহিষের পাল নিয়ে পালকেরা তৃণভূমিতে চড়িয়ে বেড়ায়। এ সময়ে রাখালের কাজ থাকত খুবই কম। অলস মুহূর্ত কাটানোর জন্য তারা মহিষের পিঠে চড়ে গান বাঁধতো। সেগুলোতে সুর দিয়ে আপন মনে গেয়ে উঠত। পাহাড়ের পাদদেশীয় উপত্যকা বা তরাই অঞ্চল থেকে মহিষ পালকের কণ্ঠের সে সকল গান বা ধ্বনি পাহাড়ের গায়ে লেগে প্রতিধ্বনিত হতো বলেই ভাওয়াইয়া গানের সুরে বিশেষ ভাঁজ লক্ষ্য করা যায়। দোতারা ভাওয়াইয়া গানের অন্যতম সহযোগী যন্ত্র। গরু কিংবা মহিষের গাড়িতে চলার সময় যে দোলা অনুভূত হয়, ভাওয়াইয়া গানেও ঠিক সে দোলাতেই দোতারা বাজানো হয়। শিল্পীরা নিজ হাতে স্থানীয় উপকরণেই গড়ে নেয় এসকল দোতারা। দোতারা বাদ্যযন্ত্রকে উদ্দেশ্য করেও অসংখ্য ভাওয়াইয়া গান রচিত হয়েছে। ভাওয়াইয়া গানের বিষয়বস্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

গাড়িয়াল বন্ধুর গান: গরুর রাখাল কিংবা গরুর গাড়ির চালক নিজে এই গান করেন। কখনও কখনও গাড়িয়ালকে উদ্দেশ্য করেও এই গান করা হয়:

বাওকুমটা বাতাস যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে
ওকি ওরে ঐমতন মোর গাড়ির চাকা পন্থে পন্থে ঘোরে রে
ওকি গাড়িয়াল মুই চলঙ রাজপন্থে।
বিয়ানে উঠিয়া গরু গাড়িত দিয়া জুড়ি
ওরে সোনা মালার সোনার বাদে চান্দের দ্যাশে ঘুরিরে।
গাড়ির চাকা ঘোরে আরও মধ্যে করে রাও
ওরে ঐমতো কান্দিয়া উঠে আমার সর্বগাও রে।

মইষাল বন্ধুর গান: মহিষের বাথানের রাখাল কিংবা মহিষের গাড়ির চালক এই গান করেন। কখনও কখনও মহিষের গাড়ির চালককে উদ্দেশ্য করেও এটি গীত হয়।

ওকি মইষাল রে
ঘাটের উপরে দিয়া বাদাম
মইষালী গানে দোতারা বাজান
প্রাণ কান্দে মোর তোর ভাওয়াইয়া গানে রে।

(সংক্ষেপিত)

মাহুত বন্ধুর গান: হাতির চালক বা মাহুত এই গান নিজে করে থাকেন। অপেক্ষাকৃত উঁচু ভূমিতে যেখানে হাতির চলাচল, সেখানে বেশি শুনতে পাওয়া যায়। আবার কখনও মাহুত বন্ধুকে উদ্দেশ্য করেই এ সুর গাওয়া হয়। নিচের গানটি দ্বৈতকণ্ঠে গাওয়া হয়ে থাকে।

মেয়ে কণ্ঠ-
তোমরা গেইলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধুরে
হস্তির নড়ান হস্তির চড়ান হস্তির পায়ে বেড়ি

ওরে সত্যি করিয়া কনরে মাহুত কোনবা দেশে বাড়িরে।

ছেলে কণ্ঠ-

হস্তির নড়ান হস্তির চড়ান, হস্তির গলায় দড়ি

ওরে সত্য করিয়া কংরে কন্যা গৌরিপুরে বাড়িরে।

(সংক্ষেপিত)

সমীর ভাওয়াইয়া গানের এরকম প্রকারভেদ বেশ মনোযোগের সাথেই খেয়াল করছিল। সে রাইসুল মামাকে জিজ্ঞাসা করল ভাওয়াইয়া গানের সুর খুবই দীর্ঘ এবং টানা। এভাবে টানা সুরে গান গাওয়া কিভাবে সম্ভব? উত্তরে রাইসুল মামা বললেন–এটা হলো চর্চার বিষয়। তুমি যত বেশি সারগম বা স্বরচর্চা করবে তত বেশি দম ও সুরের বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

একথা শুনেই ইরা বলল চলো তাহলে আমরা লম্বা সুরে স্বরচর্চা করি। আমরা আগেই যে কাহারবা তাল শিখেছি। কাহারবার ধীর লয় বা গতিতে চলে এমন সারগম চর্চা করতে চাই। রাইসুল মামা তাদের অনুশীলনের জন্য নিচের সারগমটি শিখিয়ে দিলেন।

এই পাঠে আমরা কাহারবার ধীর লয় বা গতিতে চলে এমন সারগম চর্চা করব।

আরোহণ –

+				০				+
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১
স	া	া	া	া	া	া	া	া
র	া	া	া	া	া	া	া	া
গ	া	া	া	া	া	া	া	া
ম	া	া	া	া	া	া	া	া
প	া	া	া	া	া	া	া	া
ধ	া	া	া	া	া	া	া	া
ন	া	া	া	া	া	া	া	া
র্স	া	া	া	া	া	া	া	া

অবরোহণ –

+				০				+
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১
র্স	।	।	।	।	।	।	।	।
ন	।	।	।	।	।	।	।	।
ধ	।	।	।	।	।	।	।	।
প	।	।	।	।	।	।	।	।
ম	।	।	।	।	।	।	।	।
গ	।	।	।	।	।	।	।	।
র	।	।	।	।	।	।	।	।
স	।	।	।	।	।	।	।	।

অনুশীলনের পর রাইসুল মামা বললেন এই উত্তরের জনপদে ভাওয়াইয়া গানের মতো জনপ্রিয় একটি নাচ হলো সাঁওতাল নাচ।

কৃষিজীবী সাঁওতাল পরিবারে রয়েছে বার মাসে তের পার্বণ। নৃত্য, গীত প্রিয় সাঁওতাল উৎসব এলেই বাড়ির উঠোনে বাজে মাদল, শিঙ্গা, মন্দিরা আর ঢোল। উৎসবে মেতে ওঠে গ্রামের ছেলে-বুড়ো সবাই। বিভিন্ন ঋতুকে কেন্দ্র করে থাকে নানা ধরনের উৎসবের আয়োজন। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বছর শুরুই হয় ফাল্গুন মাস থেকে। ফাল্গুন মাসে শালই উৎসব হয়ে থাকে, চৈত্র মাসে হয় বঙ্গাবঙ্গি, হোম হয় বৈশাখ মাসে, আশ্বিনে দিবি, আর পৌষে হয় সোহরাই। আর এই উৎসবের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হলো সাঁওতাল মেয়েদের দলবদ্ধ নৃত্য। আরেকটি উল্লেখযোগ্য পার্বণ হলো বাহা উৎসব। ফাল্গুনের রাঙা পলাশের মতন রঙ্গিন এই বাহা উৎসব। এই উৎসবেরও প্রধান আকর্ষন নাচ। পুরুষেরা বাজায় ধামসা, মাদল, টিকারা, বাঁশি। আর পরনে থাকে ধুতি। মাথায় পরে কখনও ময়ূরের সরু পালক, কখনও মোটা একগুচ্ছ পালক, কখনও মাথায় শুধু লাল রঙের কাপড়। আর মেয়েরা কোমর জড়িয়ে শাড়ি পরে। তারা কানে কানপাশা, গলায় হার, হাতে ময়ূরের পালক এবং পায়ে ঘুঙুর লাগিয়ে নাচে অংশগ্রহণ করে। ছয় থেকে সাত জনের বেশি নানা বয়সের মেয়েরা দলগত ভাবে এই নাচে অংশগ্রহণ করে। সাঁওতাল নাচে মূলত ঝুমুর তাল বাজানো হয়।

এই পাঠে আমরা সাঁওতাল নাচের ভঙ্গিগুলো অনুশীলন করব

পদচলন

অর্ধেক গোলাকারে পাশাপাশি সকলে দাঁড়িয়ে তিন পা আগায়। আবার তিন পা পিছিয়ে তাল রক্ষা করে। পায়ে থাকে ঘুঙ্গুর। এভাবে পাশাপাশি চলতে থাকে।

সামনে-পিছনে চলার সময় প্রতি পদক্ষেপেই শরীরে একটি ঝোঁক থাকে। ঠিক যেন নদীর ঢেউয়ের মতন। বাজনার লয় বাড়ার সাথে সাথে পদচলনের গতি বৃদ্ধি হয়। সাথে দেহের ঝোঁকের দুলুনিও বৃদ্ধি হয়।

ছয় থেকে সাত জনের বেশি হলে একই ভাবে আরেকটি দল গঠন করে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়ায়। এরপর দুটি দল একইসাথে ডান থেকে বাম দিকে, আবার বাম থেকে ডান দিকে ঘুরে নাচ করে।

নাচের ভিন্নতা আনার জন্য দ্রুত লয়ের সাথে সাথে উবু হয়ে একই পদচলনের সাথে তারা নাচ করে থাকে।

মুখভঙ্গি

সাঁওতালদের নৃত্য মূলত আনন্দের নৃত্য । তাই এই নৃত্যের মুখভঙ্গিও হবে সদা হাসোজ্জ্বল।

পরের দিন সকালে তারা রওনা হলো নয়াবাদ মসজিদ দর্শনে। দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলার রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের নয়াবাদ গ্রামে অবস্থিত এই অনন্য সুন্দর স্থাপত্য নিদর্শনটি।

নয়াবাদ মসজিদ

মসজিদের প্রবেশদ্বারের ওপর ফারসি ভাষায় রচিত লিপি থেকে এর নির্মাণ তথ্য জানা যায়। পশ্চিমা দেশ থেকে আগত মুসলিম স্থাপত্যকর্মীরা ঢেঁপা নদীর পশ্চিম তীরে নয়াবাদ গ্রামে মোকাম তৈরি করেন এবং সেখানে এ মসজিদ নির্মাণ করেন।

মসজিদটি আয়তাকার, যার তিনটি গম্বুজ রয়েছে। মাঝের গম্বুজটি দুপাশের গম্বুজের তুলনায় কিছুটা বড়। মসজিদটির চারকোনায় চারটি অষ্টভুজাকৃতির মিনার রয়েছে। মসজিদে মোট ১০৪টি আয়তাকার ফলক রয়েছে ফলকগুলোতে লতাপাতা ও ফুলের নকশা রয়েছে। মোঘল স্থাপত্য নিদর্শন সম্বলিত নয়াবাদ মসজিদটি আমাদের দেশের এক অনন্য স্থাপত্য নিদর্শন।

কান্তজী মন্দির

দিনাজপুর শহর থেকে প্রায় ১২ মাইল উত্তরে দিনাজপুর-তেঁতুলিয়া মহাসড়কের পশ্চিমে ঢেঁপা নদীর পারে কান্তনগর গ্রামে এ মন্দিরটি অবস্থিত। এই মন্দিরটি স্থাপিত অষ্টাদশ শতাব্দীতে। বাংলাদেশের সর্বোৎকৃষ্ট টেরাকোটা শিল্পের নির্দশন রয়েছে এ মন্দিরে। বর্গাকৃতির মন্দিরটি একটি আয়তাকার প্রাঙ্গণের উপর স্থাপিত। মন্দিরটি তিনটি ধাপে উপরে উঠে গিয়েছে। মন্দিরটির ভিত্তি থেকে শুরু করে চূড়া পর্যন্ত ভেতরে ও বাইরের দেয়ালে পোড়ামাটির অলংকরণ রয়েছে।

কান্তজী মন্দিরের পোড়া মাটির ফলক

পোড়ামাটির ফলকগুলোতে মহাভারত ও রামায়ণের বিস্তৃত কাহিনীর অনুসরণে মনুষ্য মূর্তি ও প্রাকৃতিক বিষয়াবলি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাছাড়া কৃষ্ণের নানা কাহিনি, সমকালীন সমাজ জীবনের বিভিন্ন ছবি এবং জমিদার অভিজাতদের বিনোদনের চিত্রও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বনের ভেতর শিকার দৃশ্য, হাতি, ঘোড়া, উট সহযোগে রাজকীয় শোভাযাত্রা, কুরুক্ষেত্র ও লঙ্কার প্রচন্ড যুদ্ধের দৃশ্যাবলি চমৎকারভাবে চিত্রায়িত হয়েছে এসব পোড়ামাটির ফলকগুলোতে।

কান্তজীর মন্দিরে প্রায় পনের হাজার পোড়ামাটির ফলক রয়েছে। অপূর্ব পোড়ামাটির ফলক আর দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যশৈলি সম্পন্ন কান্তজীর মন্দির আমাদের দেশের এক অনন্য স্থাপত্য নিদর্শন।

নয়াবাদ মসজিদ ও কান্তজীর মন্দির পরিদর্শনের সাথে সাথে সকলে বন্ধুখাতায় কিছু পোড়ামাটির ফলকের ড্রইং এবং তথ্য-উপাত্ত লিখে নিল।

এরপর তারা তাজহাট জমিদারবাড়ি এবং সেখানে অবস্থিত 'রংপুর জাদুঘর' সহ আন্যান্য দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ করে তারা গেল মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ রক্তগৌরব দেখতে।

স্মৃতিস্তম্ভ রক্তগৌরব

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ২৮ শে মার্চ একটি অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৭১ সালে মার্চ মাসে সারা দেশের মতো রংপুরে ছাত্র জনতার মিছিল মিটিং আর প্রতিবাদের আগুন ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত শহরে। ২৮ শে মার্চ মুক্তিকামী বীর বাঙালির সাথে সাথে ওঁরাও, সাঁওতালসহ রংপুরের সকল মানুষ ঢোল বাজিয়ে ঘাঘট নদীর পাড়ে একত্রিত হয়। সেখান থেকে তারা বাঁশের লাঠি আর তীর-ধনুক হাতে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাওয়ের উদ্দেশ্য যাত্রা করে। মুক্তিকামী মানুষ সেনানিবাসের ৪০০ গজের মধ্যে আসতেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেশিন গানের গুলিতে শতশত মানুষ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধে নিসবেতগঞ্জের মুক্তিকামী মানুষের এই মহান আত্মোৎসর্গের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ঘাঘট নদীর তীরে নির্মিত হয়েছে রক্তগৌরব স্মৃতিস্তম্ভটি। এই স্মৃতিস্তম্ভের দণ্ডাকার অংশের উচ্চতা প্রায় ৩০ ফুট। এর নকশায় তীর ধনুক আর দেশীয় অস্ত্র প্রতীকীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। স্মৃতিস্তম্ভের বেদিটি অপেক্ষাকৃত কম উঁচু বৃত্তাকার দেয়াল দিয়ে ঘেরা। নীরবে ধীরে ধীরে তারা সমস্ত স্মৃতিস্তম্ভের জায়গাটি ঘুরে দেখল। এক গভীর অনুভূতিতে ভরে গেল তাদের মন। শ্রদ্ধায় মাথানত হয়ে গেল মহান মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের প্রতি। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পাওয়া আমাদের এই দেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবার শপথ নিল তারা। এরপর তারা যাত্রা করল পদ্মাপাড়ের উদ্দেশে।

এই অধ্যায়ে আমরা যা করব

- বইয়ে দেওয়া ছবি দেখে এবং বুঝে ছবি আঁকার অনুপাত ও ভারসাম্যের নিয়মনীতি আত্মস্থ করার চেষ্টা করব।
- বইয়ে দেওয়া শতরঞ্জির মোটিফ দিয়ে ছক আঁকা কাগজে নকশার খসড়া তৈরি করব।
- ছক এঁকে কিভাবে ছোট নকশাকে প্রয়োজন মতো বড় করা যায় তা অনুশীলন করব। বইয়ে উল্লেখিত পদ্ধতিতে ইচ্ছামতো উপকরণের উপর নকশা স্থানান্তর করে নতুন পণ্য তৈরি করব।
- কাহারবা তালে ধীর লয়ে যে আরোহণ ও অবরোহণটি দেওয়া আছে তা অনুশীলন করব। ভাওয়াইয়া গান সম্পর্কে জানব এবং নিজেদের মত করে গাওয়ার অনুশীলন করব।
- দলীয়ভাবে সাঁওতালি নাচের ভঙ্গিগুলো অনুশীলন করব।
- নিজেদের এলাকায় ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা আছে কিনা তা অনুসন্ধান করব। যদি থাকে তবে তার ছবি এঁকে রাখব এবং বর্ণনা বন্ধুখাতায় লিখে রাখব।
- শিল্পী রশীদ চৌধুরী ও তাঁর শিল্পকর্ম সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব।

পদ্মার জলে ঢেউয়ের খেলা

‘কল্পনাতে ভ্রমণ করি, নিজের মনে স্বদেশ ঘুরি’ পঞ্চরত্নের কল্পনায় স্বদেশ ঘোরার কার্যক্রম খুব আনন্দের সাথে চলমান আছে। এরই ধারাবাহিকতায় পঞ্চরত্ন এসে পৌঁছেছে পদ্মাতীরের জনপদ রাজশাহীতে। সেখানে থাকে আকাশের চাচাতো বোন মৃত্তিকা আপু আর রায়হান দুলাভাই। স্টেশনে পঞ্চরত্নকে নিতে এলো আপু আর দুলাভাই। স্টেশন থেকে বাসায় পৌঁছে সকালের নাস্তা খেতে খেতে মৃত্তিকা আপু আর রায়হান ভাই পঞ্চরত্নের বিস্তারিত ভ্রমণ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাইল। পরিকল্পনা শুনে তিনি বললেন আগে রাজশাহী সম্পর্কে তোমাদের একটা ধারণা দিই।

রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, জয়পুরহাট এই আটটি জেলা নিয়ে গঠিত হয় রাজশাহী বিভাগ। বিভাগের প্রতিটি জেলা প্রাচীন ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। তাছাড়া সিল্কের কাপড় আর রাজশাহীর আম ‘এই দুই পণ্য বিশ্বে অনন্য’ বললেন রায়হান ভাই।

পরিকল্পনা অনুসারে এবার তারা পদ্মাতীরের জেলা রাজশাহীকে ঘুরে দেখার জন্য বেরিয়েছে। প্রথমে তারা গেল পদ্মার পাড়ে, সেখানে নদী তীরে জেগে ওঠা চরে মাসব্যাপী মেলা চলছে। মেলায় ঘুরতে ঘুরতে নানা রকমের সামগ্রী তাদের চোখে পড়ল। যেমন- তাঁত, বাঁশ-বেত, মাটি, কাঁসা-পিতল, কাঠসহ বিভিন্ন উপকরণে তৈরি সামগ্রী। তাছাড়া খাবারের মধ্যে রয়েছে নানা রকমের মিষ্টি, পিঠা-পুলি, কলাইয়ের তৈরি রুটি ও নানা রকমের ভর্তা।

মৃত্তিকা আপু আর রায়হান ভাইয়ের সাথে মেলায় ঘুরতে ঘুরতে তারা দেখতে পেল, তাদের বয়সী আরোও অনেকেই মেলায় এসেছে। তাদের কয়েকজন মেলার একপ্রান্তে থাকা বড় বট গাছের নিচে বসে গান করছে। কয়েকজন আবার তার সাথে মিলে হাতে তালি দিয়ে সহপাঠীকে গান গাইতে উৎসাহ দিচ্ছে। কেউ কেউ গানের সাথে হাত-পা নেড়ে নানারকম ভঙ্গিতে নাচার চেষ্টাও করছে। মেলায় আসা দর্শনার্থীরা বিষয়টিকে বেশ উপভোগ করছে। পঞ্চরত্নও দেরি না করে সেখানে গিয়ে গানের আসরে যোগ দিল। সেখানে কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাটিয়ালি সুরের একটি গান হচ্ছিল।

মেলা

গানটি হলো—

পদ্মার ঢেউরে
মোর শূন্য হৃদয়-পদ্ম নিয়ে যা, যা রে
এই পদ্মে ছিল রে যার রাঙা পা
আমি হারায়েছি তারে।।
মোর পরান-বঁধু নাই, পদ্মে তাই মধু নাই, (নাই রে)
বাতাস কাঁদে বাইরে, সে-সুগন্ধ নাই রে
মোর রূপের সরসীতে আনন্দ-মৌমাছি নাহি ঝংকারে রে।।
ও পদ্মারে—
ঢেউয়ে তোর ঢেউ উঠায় যেমন চাঁদের আলো
মোর বঁধুয়ার রূপ তেমনি ঝিল্‌মিল্‌ করে কৃষ্ণ-কালো।
সে প্রেমের ঘাটে ঘাটে বাঁশী বাজায়
যদি দেখিস তারে, দিস এই পদ্ম তার পায়
বলিস, কেন বুকে আশার দেয়ালী জ্বালিয়ে
ফেলে গেল চির-অন্ধকারে।।

সবার সাথে হাতে তালি দিয়ে গান করতে করতে ইরা খেয়াল করল সবার হাতের তালি একই সময়ে হচ্ছে না। গানের শেষে ইরা সমীরকে জিজ্ঞাসা করল আচ্ছা, গান গাওয়ার সময় আমাদের সবার তালি একসাথে শেষ হলো না কেন? ইরার কথা শুনে সমীর বলল তাল আর লয়ের সঠিক সমন্বয় হয়নি তাই।

পঞ্চরত্নের মধ্যে সমীর আগে থেকেই গান শেখে। মায়ের কাছে গান ও গানের তাল সম্পর্কে সে জেনেছে। বিষয়টি জানা থাকার ফলে সমীর তার বন্ধুদেরকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলল, এই যে সবাই মিলে হাততালি দিচ্ছি, নির্দিষ্ট সময় পরে তালির শব্দ করছি একে বলে 'তাল' যা আমরা আগের শ্রেণিতে জেনেছি। এখানে গানটি যে তালে চলছে সেটি হলো ৬ মাত্রার বা ৬ সংখ্যার। এই তালকে বলা হয় 'দাদ্‌রা' তাল। 'দাদ্‌রা' তালের সংখ্যা এবং বোল সম্পর্কেও আমরা আগে জেনেছিলাম।

আকাশ জানতে চাইল, আগের ক্লাসে তারা 'দাদ্‌রা' তালটি শিখেছে। কিন্তু এই গানের সাথে সেটি মিলছে না কেন?

একথা শুনে সমীর বলল, আমরাতো আগের শ্রেণিতে জেনেছি প্রত্যেকটি তালের তিনটি লয় আছে। সে অনুযায়ী

দাদরা তালের চলন অনুসারে এটির তিনটি ‘লয়’ আছে। যথা— ১. বিলম্বিত লয় ২. মধ্য লয় ৩. দ্রুত লয়। গানের ধরন অনুসারে তার তাল এবং লয় নির্ধারিত হয়। কোনো গান বিলম্বিত লয়ে হয়, কোনোটি মধ্য অথবা দ্রুত লয়ে গাওয়া হয়। যেকোনো তালের বিলম্বিত গতিকে দ্বিগুণ কিংবা তিনগুণ করলেই তালের লয় বা গতি বেড়ে যায়।

এই পাঠে আমরা হাতে তালি দিয়ে দ্রুত দাদরা তাল অনুশীলন করব

তালি

খালি

+				০				+	
১	২	৩	।	৪	৫	৬	।	১	[সংখ্যা দিয়ে লিখলে এমন] বিলম্বিত লয়
ধা	ধি	না	।	না	তু	না	।	ধা	[একমাত্রায় লিখলে এমন] বিলম্বিত লয়
ধাধি	নানা	তুনা	।	ধাধি	নানা	তুনা	।	ধা	[দ্বিগুণ করলে এমন] বোলসহ মধ্য লয়
ধাধিনা	নাতুনা	ধাধিনা	।	নাতুনা	ধাধিনা	নাতুনা	।	ধা	[তিনগুণ করলে এমন] বোলসহ দ্রুত লয়

এবার সবাই মিলে হাতে তালি দিয়ে দাদ্‌রা তালের দ্রুত চলন শিখে নিল। গানের তালটি সম্পর্কে জানবার পর কোরাসে গানটি গাইতে সবার বেশ ভালোই লাগল।

এরই মধ্যে মেলা অঙ্গনে মাইকের ঘোষণা থেকে তারা জানতে পারল আজ বিকেলে মেলার মঞ্চে রাজশাহী আঞ্চলের লোক গান পরিবেশিত হবে। যার মধ্যে রয়েছে আলকাপ গান, বারাসিয়া গান, ঝান্ডির গান এবং গম্ভীরা গান।

এই ঘোষণা শুনেই পঞ্চরত্ন খুব আনন্দিত হলো। মৃত্তিকা আপু আর রায়হান ভাইয়ের সাথে কথা বলে তারা আজকের সময়গুলো এই মেলাতেই কাটানোর সিদ্ধান্ত নিল। এসব গান সম্পর্কে তারা আগে সামান্য জেনেছে কিন্তু কখনও তারা পরিবেশন দেখেনি বা শোনেনি। এখানকার জনপ্রিয় গান আঞ্চলিক গীতরীতি নামে পরিচিত হলেও সারাদেশে তার সমাদর রয়েছে। এই সুযোগে তারা পদ্মাপাড়ের বিভাগ রাজশাহী অঞ্চলের জনপ্রিয় সংগীত রীতি সম্পর্কে জানতে পারবে।

এরমধ্যে রাজশাহীর বিখ্যাত কলাইয়ের রুটি ও রসুন ভর্তা, বেগুন ভর্তা, শুটকি ভর্তাসহ বিভিন্ন রকমের ভর্তা সাথে জিলাপি, গরম মিষ্টি দিয়ে দুপুরের খাবার পর্ব শেষ করল।

বিকেল হতেই তারা আবারও মেলায় পৌঁছে গেল। সংগীত পরিবেশনার তালিকা তৈরির কাজ শুরু করলো। এদিন বিকেলে গান শোনার পাশাপাশি বিভিন্ন গানের দলের শিল্পীদের সাথে কথা বলে তারা স্থানীয় গান ও নাচের একটা তালিকা তৈরি করেছে। তাছাড়া তারা দুটি দলে ভাগ হয়ে মেলায় আগত স্থানীয় মানুষের সাথে কথা বলে লোকক্রীড়া, লোকশিল্প, লোকনৃত্য, লোকনাট্যেরও একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করেছে। এই সব তথ্য সংগ্রহে মৃত্তিকা আপু আর রায়হান ভাই তাদের অনেক সহযোগিতা করলেন। রাতে তারা বাসায় ফিরে দুদলের তৈরি করা তালিকাগুলো মিলাল। তালিকাগুলো মিলানোর পর তারা দেখল 'গম্ভীরা গান' এর বিষয়ে তারা সবাই বেশ গুরুত্বের সাথে তথ্য নিয়েছে। এটির পরিবেশনাও তারা উপভোগ করেছে।

আগুন বলল, গম্ভীরা গান কে বা কারা সৃষ্টি করেছেন, কেন সৃষ্টি করেছেন, এ গানের বিষয়বস্তু কি, কোথায়, কখন, কিভাবে এটি গাওয়া হয়, এ বিষয়ে কিভাবে আমরা আরোও বিস্তারিত জানতে পারি?

আগুনের এই কথা শুনে রায়হান ভাই বললেন আমি তোমাদের এই সব তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করতে পারি। কারণ আমি চাঁপাইনবাবগঞ্জসহ সমগ্র রাজশাহী বিভাগের প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুরে শিল্পীদের সাথে কথা বলে বছর দুই আগে একটা গবেষণাপত্র তৈরি করেছিলাম।

গম্ভীরা গান

এবার রায়হান ভাই গম্ভীরা সম্পর্কে বলতে লাগলেন। গম্ভীরা গানের আদি উৎপত্তিস্থল পশ্চিমবঙ্গের মালদহ অঞ্চলে। তবে আধুনিক গম্ভীরা গানের সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়। আধুনিক এই গম্ভীরা গানের প্রবর্তক কিংবদন্তী শিল্পী 'ওস্তাদ শেখ সফিউর রহমান ওরফে সুফি মাস্টার'। দেশভাগের পর তিনি গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুর বাজার এলাকায় পরিবারসহ স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে গম্ভীরা গানের 'নানা-নাতি' চরিত্রের সৃষ্টি করে তিনি এ গানের নবনির্মাণ করেন। মূলত তিনি স্বভাবকবি ছিলেন। অসংখ্য গম্ভীরা ও আলকাপ গান রচনা করেছেন। শুধু গান রচনাই নয়, গম্ভীরার নিজস্ব সুর, নাচের ভঙ্গি, অভিনয় এবং ছন্দভঙ্গির প্রবর্তকও তিনি। নতুন নতুন বিষয়ে উপর গম্ভীরা লিখে এ গানকে সবার কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

গ্রাম বাংলায় প্রচলিত কাহিনি, সাধারণ মানুষের জীবনাচার, সামাজিক সমস্যা, আঞ্চলিক ভাষার সুনিপুণ প্রয়োগে লোকনাট্যগীতের এই ধারাটি বিকশিত হয়েছে। গানের সুরটি বিশেষ গঠনের হওয়ার কারণে এটি 'গম্ভীরা সুর' নামেই পরিচিতি পেয়েছে। তবে গম্ভীরা গানকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে জনপ্রিয় করে তোলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জেরই আরও দুজন কৃতীসন্তান। তাঁরা হলেন 'রকিবউদ্দীন' এবং 'কুতুবুল আলম' জুটি। বাংলাদেশের সবার কাছে তাঁরা গম্ভীরার নানা-নাতি হিসেবেই পরিচিত।

নানার মুখে সাদা রঙের পাকা দাড়ি, মাথায় মাথাল, পরনে লুঙ্গি, হাতে পাচনি বা ছোট লাঠি আর নাতির পোশাক হলো গায়ে ছেড়া গেঞ্জি, কখনো কাঁধে লাঙল, পরনে লুঙ্গি ও কোমরে গামছা, পায়ে ঘুঙুর, সেই গামছার আঁচলে কলাইয়ের রুটি অথবা ছাতু বাঁধা। বেশিরভাগ সময়ে ঢোল, হারমোনিয়াম, বাঁশি, তবলা, জুড়ি বাদ্যযন্ত্রগুলোর সাহায্যে গম্ভীরা গাইতে দেখা যায়। সাধারণত বছরের শেষ দিনে অর্থাৎ চৈত্র মাসে এবং নতুন বছরের শুরুতে অর্থাৎ বৈশাখ মাসে এ গান পরিবেশন করবার রীতি প্রচলিত আছে।

এরমধ্যে সমীর প্রকৃতি ও পরিবেশ নিয়ে বিভিন্ন শিল্পীর রচিত গম্ভীরা গানের সাথে নিজের মতো করে নতুন কথা সংযোজন করে গম্ভীরা গান রচনার চেষ্টা শুরু করে দিল। পরের দিন 'সমীর' বেশ আগ্রহের সাথেই গম্ভীরা গানের যে অংশগুলো সে লিখেছে তা সুর-সহযোগে গেয়ে শুনাল।

গান—

বন্যা-খরা ঝড়-জলোচ্ছ্বাস প্রাকৃতিক দুর্যোগ যত হয়

বৃক্ষছাড়া চারপাশের এই পরিবেশ বাঁচানোর উপায় নাই- নানা হে...

খাল-বিল আর জলাধার যত

নদী-নালা শত শত

পাহাড়-জঙ্গল-বন-বনানীর সঠিক রক্ষা করা চাই- নানা হে......

ঘূর্ণিবাতাস, বজ্রঝড়ে কতজনার প্রাণ যায়

আম-কাঁঠাল, ক্ষেতের ফসল সবকিছুরই ক্ষতি হয়- নানা হে.......

ফল-ফলাদির গাছ লাগাও, দেশের পরিবেশকে বাঁচাও

আশের-পাশের পতিত জমি রেখোনারে আর ফেলি- নানা হে.........

সমীরের গানটা সবাই আনন্দের সাথে উপভোগ করল। এরপর অবনী বলল শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে আমি একটা গম্ভীরা গান লিখার চেষ্টা করেছি। এবার সে তার লেখা ও সুর করা গানটি গেয়ে শুনাল।

লেখাপড়া খেলাধুলা খাওয়া দাওয়া যা করি
গান বাজনা, আলকাপ, কবি, গম্ভীরা, জারি সারি, নানা হে-
লুঙ্গি-সার্ট-পাঞ্জাবি-শাড়ি এগুলাই হারগে সংস্কৃতি
কীর্তন, পদাবলী, বেহুলা লাচি, মেয়েলি গীত গায় এখন, নানা হে-
হে নানা শিল্প সংস্কৃতিই হলো এই বাঙালির পরিচয়, নানা হে-

সমীর আর অবনীর গানগুলো সবাই দলীয়ভাবে গাওয়ার চেষ্টা করল। এরমধ্যে ইরা বলল আমরা স্কুলে ফিরে শ্রেণির সবাইকে নিয়ে গম্ভীরা পরিবেশনার একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারি। প্রকৃতি ও পরিবেশ বিপর্যয় এবং শিক্ষা বিষয়ে সচেতনতা তৈরির জন্য আমরা নিজেদের রচিত এই গানগুলো গম্ভীরা ভঙ্গির সাথে মিলিয়ে পরিবেশন করব।

পরের দিন পঞ্চরত্ন রাজশাহীর বিখ্যাত সিল্ক তৈরির প্রক্রিয়াটা দেখতে চাইল। রেল স্টেশনে নেমেই তারা দেখেছে রেশম কারখানা ও সেরিকালচার বোর্ডের সাইনবোর্ড। তারা রায়হান ভাইকে বিষয়টা জানালে তিনি পরের দিন তাদের কারখানা দেখাতে নিয়ে যাবার কথাটি জানালেন।

রাজশাহী সিল্ক

পরদিন সকালে সবাই সরকারি সিল্ক ফ্যাক্টরি দেখতে গেল। রায়হান ভাইয়া পঞ্চরত্নদের দেখাল কীভাবে তুঁত গাছের পাতা খেয়ে রেশম পোকা বড় হয়। পর্যায়ক্রমে পোকা রেশম গুটিতে পরিণত হয়ে সিল্ক সুতায় রূপান্তর হয়। গুটি সেদ্ধ করে সুতার মুখ বের করা হয়। চরকা ঘুরিয়ে সুতা সংগ্রহ করে তাঁতের সাহায্যে সিল্ক কাপড় বুনন দেখে সবাই তো অবাক! সেই কাপড় থেকে শাড়ি, নানান রকম জামা, ওড়না, পাঞ্জাবি, ফতুয়া, টাইসহ কতোকিছু তৈরি হচ্ছে।

রাজশাহীতে বেসরকারি পর্যায়েও বেশকিছু ফ্যাক্টরিতে এভাবে সিল্ক কাপড় বুনন, ডিজাইন, রং করা, প্রিন্ট, পলিশ, ফিনিশিং ও বাজারজাতের ব্যবস্থা আছে। এই অঞ্চলের নারীরা সিল্ক কাপড়ে বাটিক, টাই-ডাই, হ্যান্ডপ্রিন্ট, ব্রাশপ্রিন্ট, ব্লকের মধ্য দিয়ে হরেক রকমের প্রাকৃতিক ও জ্যামিতিক নকশা ফুটিয়ে তুলে রাজশাহী সিল্ককে জনপ্রিয় করে তুলেছে। তাঁর সাথে সাথে নিজেরাও স্বাবলম্বী হচ্ছে। বিদেশেও এই সকল সিল্ক পণ্যের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। ফলে এই সব সামগ্রী দেশের বাইরে রপ্তানি করে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হচ্ছে।

সিল্ক ফ্যাক্টরি

এরপর সিল্ক কাপড়ে নকশা সম্পর্কে জানতে পঞ্চরত্ন রাজশাহী চারুকলা অনুষদের কারুকলা বিভাগে গেল। সেখানে তারা কাপড়ের উপর টাই-ডাই, বাটিক, হ্যান্ডপ্রিন্ট, স্ক্রিনপ্রিন্ট, ব্লকপ্রিন্ট, অ্যাপ্লিক ইত্যাদি মাধ্যমে নকশা করার পদ্ধতি দেখল। কারুকলা বিভাগের একজন শিক্ষকের কাছে নকশা তৈরি সম্পর্কে জানতে চাইলে শিক্ষক বললেন, ছবি আঁকার গুরুত্বপূর্ণ নিয়মনীতির একটি হলো ছন্দ (rhythm)। সমীর বলল নাচে এবং গানেওতো ছন্দ আছে। তিনি বললেন শিল্পকলার সবখানেই ছন্দ আছে। আকাশ ছবি আঁকার ছন্দ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন-

ছবি আঁকার উপাদানগুলোর নান্দনিক গতিময়তাকে ছন্দ (rhythm) বলে। ছবি আঁকায় প্রধানত তিন রকমের ছন্দের বেশি ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—পুনরাবৃত্তিক ছন্দ, ধারাবাহিক ছন্দ, ক্রমবর্ধমান ছন্দ।

পুনরাবৃত্তিক ছন্দে ব্যবহৃত আকৃতিগুলো সমান মাপে এবং সমান দূরত্বে থাকে। ধারাবাহিক ছন্দে সমান মাপে আকৃতিগুলো একই দূরত্বে থাকে না। ক্রমবর্ধমান ছন্দে আকৃতিগুলো এবং দূরত্ব কম থেকে বেশি হয়ে থাকে। এই তিনটি ছন্দের নিয়মনীতি অনুসরণ করে তোমরা খুব সহজে নতুন নতুন নকশা তৈরি করতে পার। তোমাদেরকে ছবি আঁকার ছন্দ ব্যবহার করে নকশা তৈরির একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা দেই।

এই পাঠে আমরা কাগজ কেটে ছবি আঁকার ছন্দ ব্যবহার করে নকশা করব

এই তিন রকমের ছন্দের মধ্য হতে পুর্নাবৃতিক ছন্দ এবং ক্রমবর্ধমান ছন্দের সাহায্যে খুব সহজে নকশা করা যায়। এক্ষেত্রে তোমরা প্রাকৃতিক বা জ্যামিতিক আকৃতি ব্যবহার করতে পার। এই নকশা তৈরিতে তোমরা সহজলভ্য যেকোনো দু'রঙের পোস্টার পেপার ব্যবহার করতে পার। পোস্টার পেপার পাওয়া না গেলে সেক্ষেত্রে বিভিন্ন রঙের পরিত্যক্ত কাগজের প্যাকেট কেটে তা ব্যবহার করা যাবে। এছাড়া কাগজ কাটার জন্য লাগবে ছোট একটি কাঁচি আর কাগজ জোড়া লাগানোর জন্য অল্প আঠা।

- প্রথমে দৈর্ঘ্যে ৬ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ৬ ইঞ্চি একটা বর্গক্ষেত্র আঁকব।
- বর্গক্ষেত্রটি ১ ইঞ্চি করে ছক করে নেব।
- এবার দুটি আলাদা রঙের কাগজ থেকে ১ ইঞ্চি থেকে একটু ছোট মাপের ত্রিভুজ এবং বৃত্ত এঁকে কাঁচি দিয়ে কেটে নিতে হবে। তবে চাইলে ১ ইঞ্চি মাপের ফুল এবং পাতাও ব্যবহার করা যায়।
- এবার ছক আঁকা কাগজের প্রতিটি ছকের একটিতে ত্রিভুজ পরেরটিতে বৃত্ত এভাবে আঠা দিয়ে লাগিয়ে পুনরাবৃত্তিক ছন্দের নকশা তৈরি করতে পারি। এই ক্ষেত্রে ত্রিভুজ এবং বৃত্তের পরিবর্তে চাইলে ১ ইঞ্চি থেকে একটু ছোট মাপের ফুল এবং পাতাও ব্যবহার করতে পারি।
- একইভাবে কাগজে ছোট থেকে ক্রমন্বয়ে বড় বৃত্তে এঁকে তা প্যাঁচানো (spiral) ভাবে সাজিয়ে খুব সহজে ক্রমবর্ধমান ছন্দের নকশা তৈরি করা যায়।

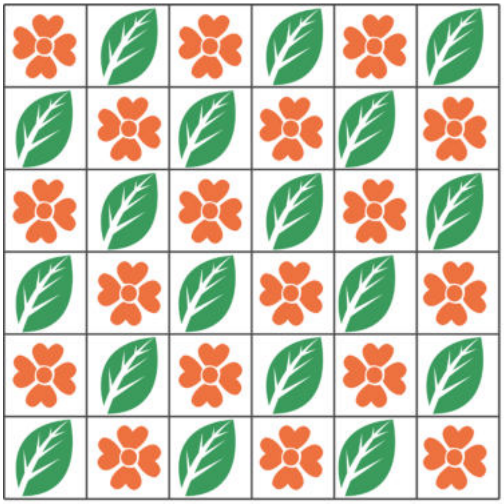

প্রাকৃতিক আকৃতিতে পুনরাবৃত্তিক নকশা

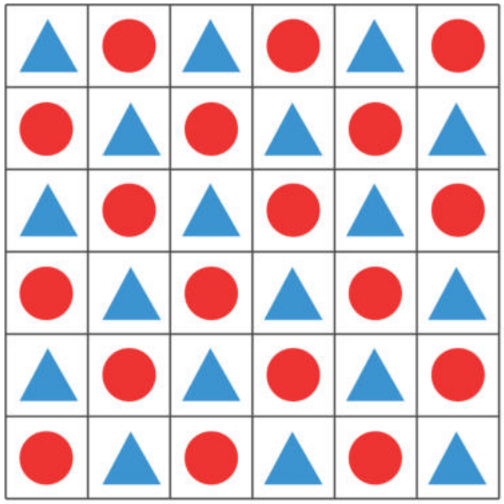

জ্যামিতিক আকৃতিতে পুনরাবৃত্তিক নকশা

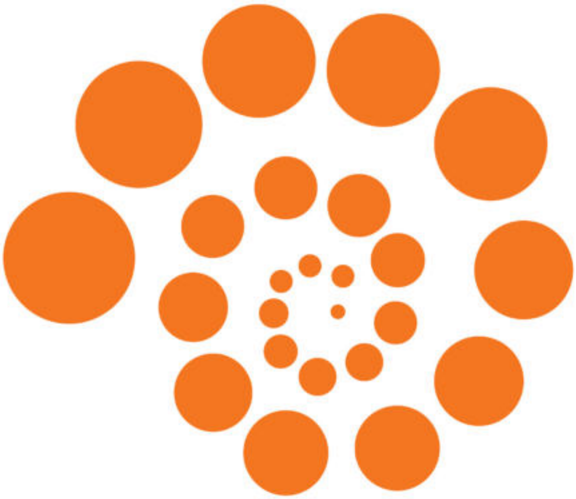

ক্রমবর্ধমান নকশা

এই নকশাগুলো পরে নিয়মনীতি অনুসরণ করে কাপড়সহ যেকোনো উপকরণের উপর স্থানান্তর করে নতুন নতুন পণ্যের নকশা করা যায়।

এই বাস্তব অভিজ্ঞতার পর চারুকলা অনুষদের শিক্ষকের সাথে তাদের অনেক কথা হলো। তিনি বললেন শিল্পীরা যখন কোনো পণ্যের গায়ে তার নান্দনিকতার পরশ বুলিয়ে দেন সাথে সাথে তা হয়ে ওঠে অনন্য সুন্দর। এবার তোমাদের তেমন একজন শিল্পীর কথা বলব। তিনি চিত্রশিল্পী হলেও তার তুলির ছোঁয়ায় নান্দনিকতা পেয়েছে আমাদের দেশের তৈরি পোশাক, পোস্টার, বইয়ের প্রচ্ছদ থেকে শুরু করে আরোও অনেক শিল্প। তিনি হলেন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী।

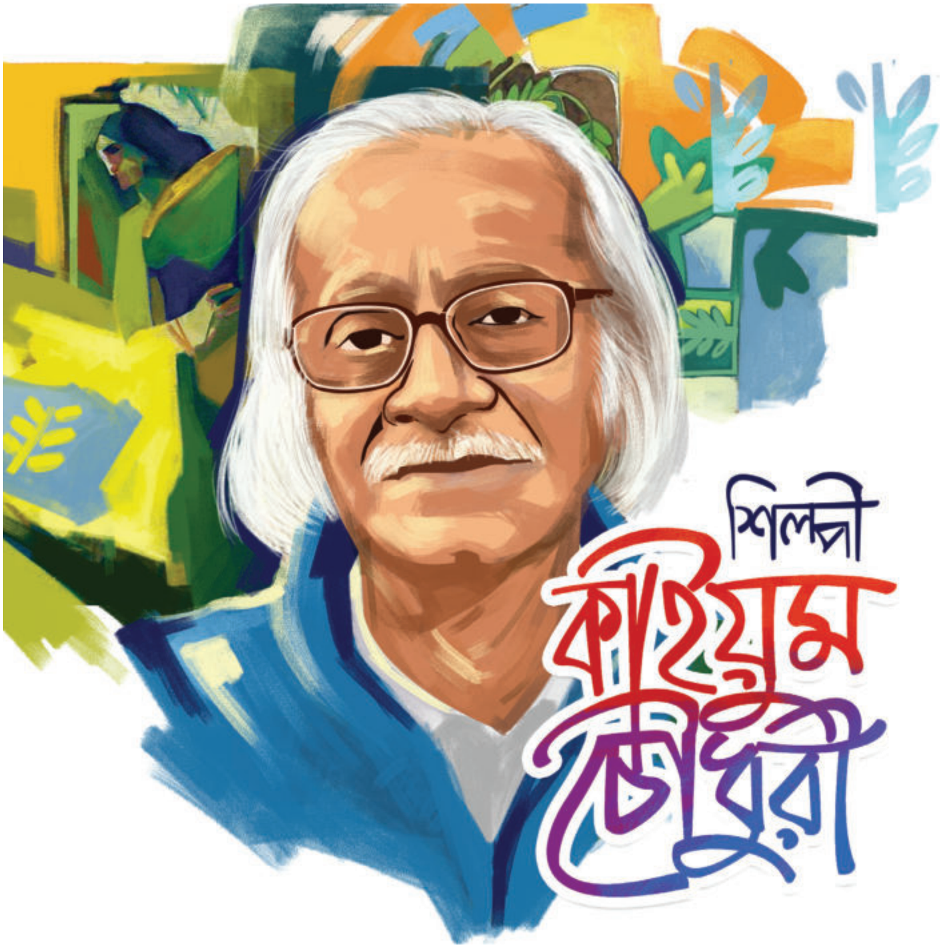

শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী ১৯৩২ সালে ফেনী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৯ সালে আর্ট ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন এবং ১৯৫৪ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে শিক্ষা সমাপন করেন। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, পটুয়া কামরুল হাসান এবং সফিউদ্দীন আহমেদের মতো দিকপাল শিল্পীদের তিনি পেয়েছিলেন শিক্ষক হিসেবে। তাঁদের কাছ থেকে কাইয়ুম চৌধুরী অর্জন করেছিল 'দেখবার' এবং 'দেখাবার' যোগ্যতা। এই শৈল্পিক দৃষ্টি শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীকে করেছে চিত্রশিল্পীর সাথে সাথে এক অনন্য নকশাবিদ। ১৯৫৭ সালে কাইয়ুম চৌধুরী আর্ট কলেজে শিক্ষকতায় যোগ দেন।

দেশীয় উপকরণে তৈরি পোশাক তাঁর হাতের নকশায় রূপ নিয়েছে এক অনন্য শিল্পকর্মে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ থেকে শীত, বসন্ত বাংলাদেশের ষড়ঋতুর প্রত্যেকটি রূপকে তিনি তার নকশা করা পোশাকে প্রকাশ করেছেন এক অপূর্ব নান্দনিকতায়। আমাদের প্রতিটি জাতীয় দিবস যেমন—আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসসহ সকল দিবসকে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী রাঙিয়েছেন তাঁর নকশা করা পোশাক দিয়ে। সিল্ক অথবা সুতিতে তৈরি শাড়ি থেকে গায়ের চাদর সবকিছু তার তুলির আঁচড়ে এক অনন্য চিত্রমালা হয়ে উঠেছে। আধুনিক

ফ্যাশনসচেতন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী তরুণ প্রজন্মের কাছে দেশের তৈরি পোশাকে জনপ্রিয় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

পঞ্চাশের দশকে পটুয়া কামরুল হাসানের হাত দিয়ে শুরু হয়েছিল দেশের তৈরি পোশাকে শিল্পের প্রকাশ ঘটানোর কাজ। সে কাজকে আরও বেশি এগিয়ে নিয়ে দেশীয় ফ্যাশনকে ব্র্যান্ডিংয়ে রূপ দিয়েছেন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী। দেশীয় ফ্যাশনের সাথে সাথে তিনি বাংলাদেশের প্রকাশনী শিল্পের রূপকে করে তুলেছিলেন নান্দনিক। তাঁর হাত দিয়ে বাংলাদেশের পোষ্টার পেয়েছিল এক অপূর্ব শৈল্পিক দিক। বইয়ের প্রচ্ছদ অঙ্কনে তিনি অনন্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তাঁর করা টাইপোগ্রাফিই ছিল এসব পোস্টার আর প্রচ্ছদের প্রাণ।

বাংলাদেশের চিত্রকলার সম্ভারকে তিনি করেছেন সমৃদ্ধ। চিত্রে তাঁর নিজস্ব রচনা শৈলির কারণে তিনি বাংলাদেশের সমসাময়িক শিল্পীদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী হিসেবে বিবেচিত। গ্রাম বাংলার প্রকৃতি, নদী, নৌকা, কৃষান, কৃষানী, পশু-পাখি সবকিছু প্রকাশিত হয়েছে পরম মমতায়। উজ্জ্বল প্রাণবন্ত রঙের ব্যবহার তাঁর শিল্পকর্মের বিশেষ দিক।

শিল্পকলায় বিশেষ অবদানের জন্য শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী ১৯৮৬ সালে একুশে পদক লাভ করেন। এছাড়া ২০১০ সালে তিনি সুফিয়া কামাল পদক এবং ২০১৪ সালে স্বাধীনতা পদক লাভ করেন । ২০১৪ সালে ৩০শে নভেম্বর তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর কিছু শিল্পকর্ম

নেপালের দৃশ্য, মাধ্যম- জলরং, ২০০৬

ঋতু- ২, মাধ্যম- জলরং, ২০০১

ফ্লোরেন্স- ১, মাধ্যম- জলরং, ২০০৫

এরপর পঞ্চরত্ন একে একে দেখতে গেল পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার, মহাস্থানগড়, বাংলাদেশের তথা প্রাচীন বাংলার অন্যতম পুরাতন স্থাপত্য পুরাকীর্তি সোনা মসজিদ। গেল মহারানী হেমন্ত কুমারী দেবীর বাসভবন পুঠিয়া রাজবাড়ী। বাংলার প্রাচীন স্থাপত্যশিল্পের এক বিশেষ নিদর্শন জোড়বাংলা মন্দির এসব নিদর্শন দেখে তারা আসল উত্তরা গণভবনে।

উত্তরা গণভবন

১৯৭২ সনে দিঘাপাতিয়া রাজবাড়িটির নাম 'উত্তরা গণভবন' নামকরণ করে প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাঞ্চলীয় বাসভবন হিসেবে সংরক্ষন করা হয়। ঢাকার বাইরে এটিই প্রধানমন্ত্রীর একমাত্র বাসভবন।

ভবনটির পিরামিড আকৃতির চারতলার প্রবেশদ্বারের উপরে রয়েছে বিশাল ঘড়ি। যা ইতালি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। প্রধান ভবন, কুমারপ্যালেস, কাচারি ভবন, তিনটা কর্তারানী বাড়ি, রান্নাঘরসহ মোট ১২টি ভবন আছে। প্যালেসের দক্ষিণে গার্ডেনে রয়েছে নকশা করা মার্বেল পাথরের ভাস্কর্য। ভবনের সামনে দুটিসহ মোট ৬টি কামান আছে। হালকা হলুদ ও রেড অক্সাইড বা ইট কালার মিশ্রিত ভবনটি পুরনো স্থাপত্যের অনন্য নিদর্শন। ভবনের চূড়ায় গোলাকৃতি নকশার মাঝে বিশাল ঘড়ি সবার নজর কাড়ে।

রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য নিদর্শনসমূহ দেখে পঞ্চরত্ন তাদের বন্ধুখাতায় অনেক নকশা এঁকে নিল। তার সাথে সাথে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ লিখে নিল।

এবার তারা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ভাস্কর্য দেখার জন্য উপস্থিত হলো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গেইটের কাছে, সিনেট ভবনের দক্ষিণ পাশে। লালচে রঙের অপুর্ব ভাস্কর্যটি দেখে তারা ভাস্কর্যের তথ্য সংগ্রহে আগ্রহী হয়ে উঠল।

সাবাস বাংলাদেশ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ স্মরণে যতগুলো স্মারক ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে "সাবাস বাংলাদেশ" ভাস্কর্য অন্যতম। এটির রং, রূপ, আকার গঠনশৈলি ও প্রকাশের বৈচিত্রতা লক্ষ্যণীয়।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রখ্যাত ভাস্কর শিল্পী নিতুন কুণ্ডুকে দিয়ে নির্মাণ করান সাবাস বাংলাদেশ ভাস্কর্যটি।

ভাস্কর্যটিতে রয়েছে দুজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। একজন গ্রামীণ যুবক, পরনে লুঙ্গি। অপরজন প্যান্ট পরা শহুরে যুবক। উভয়েরই গায়ে জামা নেই। রাইফেল হাতে নিয়ে তারা শত্রুর মোকাবেলায় সামনের দিকে দৌড়াচ্ছে। ভাস্কর্যটিতে সারা দেশের মানুষের অংশগ্রহণকে উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্রামীণ যুবকের এক হাতে রাইফেল, আরেক হাত মুষ্টিবদ্ধ ভাবে উপরে উঠানো। মাথায় তার গামছা বাঁধা। প্যান্ট পরিহিত শহরের যুবকটি দুই হাত দিয়ে রাইফেল ধরে সামনে ধাবমান। কোমরে গামছা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল বাতাসে উড়ছে। কংক্রিটের তৈরি ভাস্কর্যের পিছনে রয়েছে মুক্তমঞ্চ। ৪০ বর্গফুট বেদির উপর নির্মিত হয়েছে ভাস্কর্যটি। পিছনে ৩৬ ফুট উচ্চতার স্তম্ভ। স্তম্ভের গায়ে ৫ ফুট ব্যাসের গোলাকার ছিদ্র বা খালি অংশ আছে। এই গোলাকার অংশ দিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার বৃত্তকে বোঝানো হয়েছে।

মঞ্চের পিছনের দেয়ালে খোদাই করা রিলিফ ভাস্কর্য। তাতে উপস্থাপন করা হয়েছে নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতীসহ আপামর জনতার পতাকা মিছিল। গ্রাম-বাংলার চিরায়ত দৃশ্য, একতারা হাতে বাউল, ইত্যাদি চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই রিলিফ ভাস্কর্যে।

ভাস্কর্যের বেদিতে লেখা আছে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের বিখ্যাত কবিতা—

‘সাবাস বাংলাদেশ
এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়
জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়’

এই কবিতা সংযোজনের মাধ্যমে ভাস্কর্যের থিমকে আরও সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

এই অধ্যায়ে আমরা যা করব –

- বইয়ের মতো করে কাগজ কেটে পুনরাবৃত্তিক ছন্দের নকশা এবং ক্রমবর্ধমান ছন্দের নকশা তৈরি করে নকশা করব।
- বইয়ের মতো করে হাতে তালি দিয়ে দ্রুত দাদরা তালের সাথে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের পদ্মার ঢেউরে— গানটি গাওয়ার চেষ্টা করব।
- বিভিন্ন মাধ্যমে গম্ভীরা গান শুনে এবং দেখে বইয়ে দেওয়া গম্ভীরা গানটি ভঙ্গি করে গাওয়ার চেষ্টা করব।
- নিজেদের এলাকায় যদি কোনো শৈল্পিক পোশাক সামগ্রী বিক্রয় প্রতিষ্ঠান থাকে, সেখানে গিয়ে পোশাকের নকশা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে পারি।
- শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর জীবন ও তাঁর শিল্পকর্ম সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব।

রাজশাহী বিভাগ থেকে পঞ্চরত্নের এবার গন্তব্য খুলনায় সমীরের দিদির বাড়ি। রূপসা ও ভৈরব নদীবিধৌত

রূপসা তীরের উজান সুরে

খুলনা জনপদ একটি শিল্পসমৃদ্ধ জনপদ হিসেবেই পরিচিত। বাংলাদেশের প্রাচীন নদী বন্দরগুলোর মধ্যে খুলনা অন্যতম। শিল্প ও বাণিজ্যপ্রধান হওয়ায় এ নগরীকে 'শিল্পনগরী' বলা হয়। খুলনা, কুষ্টিয়া, বাগেরহাট, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, মেহেরপুর, নড়াইল, সাতক্ষীরা এই দশটি জেলা নিয়ে খুলনা বিভাগ গঠিত।

গাজীর পট, বাউল গান, গাজীকালু চম্পাবতীর পালা, এখানকার অন্যতম লোকসাংস্কৃতিক উপাদান। রাজশাহী থেকে খুলনা বিভাগে আসার পথে তারা ট্রেনে বাউল সাধক লালনের গান শুনতে পায়—

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি

মানুষ ছাড়া ক্ষ্যাপারে তুই মূল হারাবি।

সমীরের দিদি এবং দাদা বাবু পঞ্চরত্নকে স্টেশন থেকে বাসায় নিয়ে এলো। বাসায় ঢুকে দেয়ালে ঝুলানো একটা ছবি দেখে পঞ্চরত্নের চোখ তাতে আটকে গেল। অবনী বলল আরে এমন একটি ছবির আদলে আমাদের সপ্তম শ্রেণির শিল্প ও সংস্কৃতি বইয়ের প্রচ্ছদ করা হয়েছে। বাকিরা দেখে বলল, ঠিকতো। এবার সমীরের দিদি বললেন এই ছবিটাকে কি ছবি বলে তোমরা কি জান? আকাশ বলল গাজীর পট। দিদি বললেন ঠিক তাই গাজীর পট; আমাদের দেশের ঐতিহ্যবাহী লোক চিত্রকলার ধারা।

অবনী জানতে চাইল এই ছবিটা কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন? দিদি বললেন আমাদের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরের গ্রামে কয়েকটি পটুয়া পরিবার থাকে। তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি। তোমরা কি জান পটুয়া কাদের বলে? যারা পট আঁকেন তাদের বলে পটুয়া।

আকাশ বলল শুনেছি এসব শিল্পী নাকি প্রকৃতির বিভিন্ন উপকরণ যেমন—ফুল, লতা, পাতা, মাটি, ছাই প্রভৃতি দিয়ে রং তৈরি করে ছবি আঁকেন? দিদি বললেন তুমি ঠিক জেনেছ। তবে বর্তমান সময়ে এসে বাজার থেকে তৈরি রং কিনেও কোনো কোনো পটুয়া ছবি এঁকে থাকেন। ইরা বলল আমরা সপ্তম শ্রেণিতে প্রাকৃতিক বর্ণচক্র তৈরির করার সময় নিজেদের মতোকরে কিছুটা রং তৈরি করার চেষ্টা করেছিলাম। এবার যদি পটুয়া শিল্পীদের কাছ থেকে প্রাকৃতিক উপকরণে রং তৈরির পদ্ধতিটা শিখতে পারি তাহলে খুব ভাল হয়। আগুন বলল আমাদের এলাকায় রং পাওয়া না গেলেও আমরা সহজে নিজেদের মতো করে প্রাকৃতিক উপকরণে রং তৈরির করে ছবি আঁকতে পারব।

দিদি বললেন এই বিষয়ে তোমাদের আগ্রহ দেখে আমার খুব ভাল লাগছে। আমি আজকেই শিল্পীর সাথে যোগাযোগ করে তোমাদের জন্য প্রাকৃতিক রং তৈরি এবং পটচিত্র আঁকার একটা বাস্তব অভিজ্ঞতার ব্যবস্থা করব। সবাই খুব খুশি হয়ে দিদিকে ধন্যবাদ জানাল। সেদিনের মতো তারা সবাই বসে খুলনা ঘোরার একটা পরিকল্পনা করে ফেলল। পঞ্চরত্নের পরিকল্পনার এক ফাঁকে দিদি তাদের জানালেন—আমি পটশিল্পী নারায়ণ পটুয়ার সাথে কথা বলেছি। আমরা আগামীকাল সকালে পটশিল্পীদের গ্রামে যাব।

পরের দিন সকালে দিদির সাথে পঞ্চরত্ন পটশিল্পীদের গ্রামে পৌঁছাল। সেখানে গিয়ে তারা দেখা করল গ্রামের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ শিল্পী কানাইলাল চিত্রকরের সাথে শিল্পীকে সহযোগিতা করার জন্য । সেখানে উপস্থিত ছিলেন শিল্পীর নাতি তরুণ পটচিত্র শিল্পী নিমাইলাল চিত্রকর। তিনি বাংলাদেশের লোকচিত্রকলার এই ধারা সম্পর্কে অনেক তথ্য দিলেন। পঞ্চরত্ন সেসব তথ্যের ভিডিও মোবাইলে ধারণ করে রাখল। সাথে সাথে বন্ধুখাতায় লিখে রাখল। পটচিত্র সম্পর্কে জানাতে গিয়ে তিনি বললেন—

পটচিত্র

পটে আঁকা ছবিকে পটচিত্র বলে। পট মানে পট্ট বা এক খন্ড কাপড়ের টুকরা। সাধারণত এক খন্ড কাপড়ে পটচিত্র আঁকা হয়। বাংলার লোকচিত্রকলার অন্যতম নিদর্শন হলো এই পটচিত্র। যারা পট আঁকেন তাদের বলা হয় পটুয়া। আর যারা পট প্রর্দশন করেন তাদের বলা হয় পটকুশীলব বা গায়েন। বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পটুয়ারা প্রাচীনকাল থেকে পট আঁকার সাথে জড়িত। এই আঞ্চলের পটচিত্রের ইতিহাস প্রায়

আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন। পট প্রধানত দু প্রকার। দীর্ঘ জড়ানো পট (scroll painting) ও ক্ষুদ্রাকার চৌকা পট। জড়ানো পট ১৫-৩০ ফুট লম্বা ও ২-৩ ফুট চওড়া হয়। আর চৌকা পট হয় ছোট আকারের।

কালিঘাটের পট (চৌক পট)

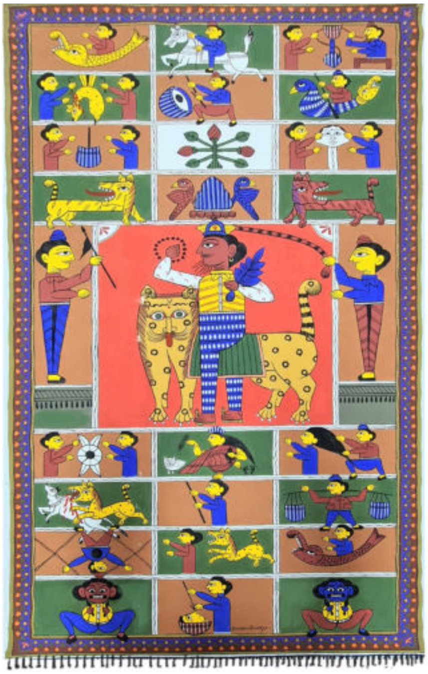

গাজীর পট (জড়ানো পট)

একসময় গ্রাম বাংলার মানুষের বিনোদনের একটি জনপ্রিয় মাধ্যম ছিল এটি। বাংলাদেশের রাজশাহী, খুলনা, যশোর, নোয়াখালী, কুমিল্লা, সিলেট, ময়মনসিংহ ও বৃহত্তর ঢাকাসহ বিভিন্ন অঞ্চল এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, বীরভূম, কোলকাতাসহ নানা অঞ্চলে পটচিত্রের ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। এসব অঞ্চলের গ্রাম-গঞ্জের মানুষের কাছে পটচিত্র ছিল বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম।

প্রথমদিকে পৌরাণিক ও ধর্মীয় ও হিতোপদেশমূলক বিষয় ছিল এসব পটের অন্যতম বিষয়বস্তু। পরবর্তীকালে সামাজিক, রাজনৈতিক ও জনসচেতনতামূলক বিষয়বস্তু পটচিত্রে আঁকা হয়। এসব পৌরাণিক ও ধর্মীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মনসাপট, রামায়ণপট, দুর্গাপট, কৃষ্ণপট, রাজা হরিশ্চন্দ্র, সাবিত্রী-সত্যবান, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, আনন্দমঙ্গল ইত্যাদি।

পশ্চিমবঙ্গের পটচিত্রের মধ্যে কালীঘাটের পট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কালীঘাটের পট মূলত চৌকাপট। যা তুলনামূলক ছোট মাপের কাগজের উপর আঁকা। ঔপনিবেশিক সময়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়কে ব্যঙ্গ করে উপস্থাপন করার বিশেষ দিক কালীঘাটের পটে দেখতে পাওয়া যায়।

তাছাড়া জনসচেতনতামূলক বিষয় যেমন—পরিবেশ বিপর্যয়, বৃক্ষরোপণ, নারী ও শিশু অধিকার, যুদ্ধের খারাপ দিকসহ নানা রকম সমসাময়িক বিষয় নিয়েও পটচিত্র আঁকা হয়।

গাজীর পট

'আশা হাতে তাজ মাথে সোনার খড়ম পায়
আল্লা আল্লা বলে গাজী ফকির হইয়া যায়।
সুন্দরবন যাইয়া গাজী খুলিলেন কালাম
যত আছে বনের বাঘ জানায় ছালাম।।'

গাজীর মাহাত্ম্যের কথা তুলে ধরার জন্য এই স্তবক বয়ান করা হয়। গাজীর বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর পোশাক, মাথায় তাজ, পায়ে সোনার খড়মের বর্ণনা করা হয়। সৃষ্টিকর্তার প্রতি গাজীর আনুগত্য ও ভালোবাসার কথাও বর্ণনা করা হয় এই অংশে। এভাবে নান্দনিকভাবে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে পরিবেশিত হয় এদেশের ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প গাজীর পটের।

শত শত বছর ধরে সুন্দরবন অঞ্চলে গাজীর ক্ষমতার কথা মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত। জঙ্গালে লোক নির্ভয়ে চলাফেরা করত গাজীর নাম স্মরণ করে। কারণ এই অঞ্চলের মানুষ বিশ্বাস করে গাজীর নামে বনের বাঘও নত হয়। বাঘ-কুমিরের ভয় হতে গাজীর নামে মানুষ রক্ষা পেতেন। সুন্দরবন অঞ্চলে কাঠুরিয়া, বাওয়ালি এবং মৌয়ালিদের পীর হলেন গাজী পীর।

বাংলাদেশের লোকচিত্রকলার মধ্যে গাজীর পট অন্যতম। আগেকার দিনে গ্রামে-গঞ্জে বাড়ির উঠানে বিনোদনের জন্য গাজীর পট প্রদর্শন করা হতো। পট প্রদর্শনের সময় শিল্পীরা ঢোল, জুড়ি বাজিয়ে গান গেয়ে পট প্রদর্শন করত। প্রদর্শন শেষে দর্শকরা চালসহ বিভিন্ন সামগ্রী বা অর্থ শিল্পীদের উপহার হিসেবে দিতেন। শিল্পীরা পটে আঁকা ছবিকে একটা লাঠির সাহায্যে নির্দেশনা দিত। সাথে সাথে সুর তাল ও কথার সমন্বয়ে গান রচনা করে তার বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করত। গাজীর পটের বর্ণনাংশে তিনটি বিষয়ের উপস্থাপনা বেশি লক্ষ্য করা যায়। যেমন—ক. গাজী পীরের মাহাত্ম্য ও অলৌকিক ক্ষমতা খ. কৌতুক মিশ্রিত হিতোপদেশ এবং গ. মৃত্যু তথা যমরাজের ভয়।

গাজীর পটের চিত্রপটটি আঁকার আগে কয়েকটি প্যানেলে ভাগ করে নেওয়া হয়। পটের মাঝের প্যানেলে আঁকা হয় গাজী পীরকে। মানিক পীর ও কালু পীরকে আঁকা হয় গাজী পীরের দুই পাশে। নাকাড়া বাদনরত ছাওয়াল ফকিরকে আঁকা হয় উপর থেকে দ্বিতীয় সারিতে। কেরামতি শিমুল গাছটা আঁকা হয় তৃতীয় সারির মাঝের প্যানেলে। তাছাড়া বাঘ, শিমুল গাছ, তসবি, হুক্কা, শিকারকৃত হরিণ ইত্যাদি বিষয়বস্তু রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। পট আঁকার ধরন বাস্তবতার সাথে মিল না রেখে বিশেষভাবে আঁকা হয়। তাছাড়া পটচিত্রে রঙের ব্যবহার করা হয় সমতলভাবে। প্রতিটি প্যানেলের ফ্রেমের চারপাশে সাদা রঙের উপর কালো অথবা খয়েরি রঙের শিকলের মতো নকশা করা থাকে।

গাজীর পট তৈরির পদ্ধতি

গাজীর পট মূলত জড়ানো। নির্দিষ্ট মাপের মোটা কাপড়ের উপর এই পট আঁকা হয়। প্রথমে তেঁতুল বিচিকে আগুনে হালকা ভেজে নিয়ে পানিতে ঘণ্টা খানেক ভিজিয়ে রাখলে খুব সহজে তার খোসা ছাড়িয়ে নেওয়া যায়। খোসা ছাড়ানোর পর তা শুকিয়ে পাটায় পিষে গুঁড়া করে নিতে হয়। এরপর পানির সাথে মিশিয়ে আগুনে জ্বাল

দিয়ে আঠা তৈরি করা হয়। তেঁতুল বিচির আঠা অথবা বেলের আঠার সাথে চক পাউডার ও ইটের গুঁড়া মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করে কাপড়ের উপর প্রলেপ দেওয়া হয়। আবার কোনো কোনো পটুয়া কাপড়ের উপর গোবর ও আঠার প্রলেপ দিয়ে প্রথমে একটি জমিন তৈরি করেন। কাপড়ের উপর প্রলেপ দেয়ার পর তা ভালভাবে রোদে শুকিয়ে প্যানেলগুলো ভাগ করে নিয়ে তার উপর ছবি আঁকা হয়।

পটচিত্র আঁকতে নানা ধরনের উদ্ভিদ ও খনিজ পদার্থ থেকে তৈরি নানা রকমের রং ব্যবহার করা হয়। যেমন— শিমের পাতা থেকে সবুজ, কালকেশি থেকে গাঢ় সবুজ, কাঁচা হলুদ থেকে হলুদ রং, শঙ্খগুঁড়া থেকে সাদা, সিঁদুর থেকে লাল, খড়িমাটি থেকে মেটে হলুদ, নীল গাছ থেকে নীল রং তৈরি করা হয়। ছাগল বা ভেড়ার লোম থেকে তুলি তৈরি করে পটচিত্র আঁকা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন রাসায়নিক রং বাজারে কিনতে পাওয়া যায় যা দিয়ে শিল্পীরা পটচিত্র আঁকেন।

গাজীর পট প্রদর্শন ও পরিবেশন

এরপর দিদি পঞ্চরত্নকে বাংলার পটচিত্র সম্পর্কে আরও কিছু নতুন তথ্য দিতে গিয়ে বলেন—

ভারতীয় আধুনিক চিত্রশিল্পের অন্যতম শিল্পী যামিনী রায় তাঁর শিল্পকর্মে পটচিত্রের আঙ্গিকে নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন। বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রশিল্পের পথিকৃত শিল্পী কামরুল হাসান তাঁর শিল্পকর্মে পটশিল্পীদের অঙ্কন শৈলিকে নিজের শিল্পকর্মে নান্দনিকভাবে ব্যবহার করেছেন। তিনি নিজের নামের সাথে পটুয়া শব্দটি ব্যবহার করতেন। এই শিল্পীদের প্রচেষ্টায় আধুনিক শিল্পজগতে পটশিল্প এক নতুন মাত্রা লাভ করে।

সময়ের সাথে সাথে বর্তমানে মানুষের বিনোদনের মাধ্যমের পরিবর্তন হয়েছে, ফলে লোকচিত্রকলার এই ধারা প্রায় বিলুপ্তির পথে। বাংলাদেশের ঢাকায় অবস্থিত বাংলা একাডেমি এবং নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘরে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় আশুতোষ মিউজিয়াম ও গুরুসদয় দত্ত মিউজিয়ামের সংগ্রহশালায় বেশকিছু গাজীর পট সংগৃহীত আছে।

নবীন এবং প্রবীণ পটচিত্র শিল্পীদের সাথে সাথে দিদির কাছ থেকে পটচিত্র সম্পর্কে এই সব গুরুত্বপুর্ণ তথ্য পেয়ে অনেক খুশি হলো সবাই। এবার পঞ্চরত্ন বিনয়ের সাথে শিল্পী কানাইলাল চিত্রকরের কাছ থেকে রং তৈরি করার প্রক্রিয়াটি শিখতে চাইল। তাদের অনুরোধে শিল্পী শেখানোর প্রক্রিয়াটি শুরু করলেন।

পাতা, ফুলসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে রং তৈরির পদ্ধতি

- বিভিন্ন রকমের পাতা, ফুল সংগ্রহ করে তা পানি দিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিতে হবে।
- তারপর পাতা অথবা ফুলগুলো ছোট ছোট টুকরো করে তা শিল-নোড়া অথবা পরিষ্কার পাথর দিয়ে ভালো করে পিষে নিতে হবে।
- এবার পিষানো পাতা বা ফুলগুলো পরিষ্কার সুতি কাপড়ে নিয়ে চাপ দিয়ে ছেঁকে নিতে হবে।
- ছাঁকা পাতা বা ফুলের রসে বেলের অথবা তেঁতুল বিচির আঠা মিশিয়ে রঙ তৈরি করে ছোট কৌটায় রেখে তা ব্যবহার করা যায়।
- কালো রং তৈরির জন্য প্রথমে একটা চেরাগ অথবা কুপি জ্বালিয়ে নিতে হবে। এবার ছোট স্টিলের একটা বাটি অথবা প্লেট সে চেরাগ অথবা কুপির উপর ধরলে তাতে কুপির আগুন থেকে বের হওয়া কালি / কার্বন গুলো আটকে যাবে। পরে বাটি/ প্লেটের গায়ে আটকে যাওয়া সে কার্বনগুলো সংগ্রহ করে তা বেলের অথবা তেঁতুল বিচির আঠার সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে কালো রং তৈরি করা যায়।
- পানের সাথে খাওয়া খয়ের থেকে খয়েরি রং, খড়ি মাটি থেকে মেটে হলুদ, কাপড়ের নীল থেকে নীল রং তৈরি করা যায়।

- ফুল ও পাতা থেকে রং বানানোর ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে আমরা যে রঙের ফুল ও পাতা সংগ্রহ করব তা থেকে কাছাকাছি রং পাব। তৈরির প্রথম দিকে রংগুলো কিছুটা হালকা থাকে। সেক্ষেত্রে রংগুলোকে একটু আগুনে জ্বাল দিয়ে ঘন করে নিলে ব্যবহার করতে সহজ হয় এবং তার স্থায়িত্ব বাড়ে। এই ক্ষেত্রে বেলের অথবা তেঁতুল বিচির আঠা পাওয়া না গেলেও খুব সমস্যা হয় না। এই ধরনের রং পরিবেশবান্ধব যা আমাদের শরীরের কোনো ক্ষতি করে না।

শিল্পী কানাইলাল চিত্রকরের কাছে পঞ্চরত্ন সারাদিন পট আঁকা এবং রঙ তৈরি সম্পর্কে অনেক কিছু শিখল। এবার বিদায় নেওয়ার পালা। সারাদিন এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা লাভ করে শেষ বিকেলের সূর্যের আলোকে সাথি করে পঞ্চরত্ন দিদির সাথে ফিরে চলল ঘরের দিকে। দেশের ঐতিহ্যময় লোকচিত্রকলার সমস্ত শিল্পীর প্রতি সম্মান আর ভালবাসা জানিয়ে এই শিল্পের গৌরবগাঁথা সাথে নিয়ে তারা চলল নতুন কিছু করার প্রত্যয়ে।

বাউল গান

পরের দিন পঞ্চরত্ন গেল কুষ্টিয়া লালন শাহ্ এর মাজারে। লালন শাহ্ এর মাজারের এলাকায় প্রবেশ করতে করতে প্রায় বিকেল হয়ে গেছে। সেখানে গিয়ে তারা দেখতে পেল কয়েকজন বাউল হাতে একতারা, মন্দিরা নিয়ে লালনের গান পরিবেশন করে চলেছে। গান গাওয়ার সময় তারা বিশেষ ভঙ্গিতে নৃত্যও করছে।

লালনের আখড়াবাড়ি এলাকায় থাকা একটি বাউলের ভাস্কর্যকে দেখিয়ে সমীর বলল আমি জেনেছি একতারা বাউল গানের মূল বাদ্যযন্ত্র। এটি লাউয়ের খোল, চামড়া, বাঁশ ও তার দিয়ে তৈরি।

এইবার পঞ্চরত্ন দেখতে পেল লালনের মাজারের পাশেই রয়েছে লোকবাদ্যযন্ত্র বিক্রয়ের দোকান। সেখানে কারিগরেরা কিভাবে এটি বানাচ্ছে তা তারা মনোযোগের সাথে দেখে নিল। পঞ্চরত্ন একতারা সম্পর্কে জানতে

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

চাইলে বিক্রেতারা বলল এটিতে কেবল একটি স্বরের ব্যবহার হয়। কারণ তারটি বেশিরভাগ সময়ে গায়ক যে স্কেলে গান করে থাকে সে স্কেলের ‘সা’ এর সুরে বাঁধা থাকে। বিক্রেতারা পঞ্চরত্নকে একতারা বাজানোর কৌশল শিখিয়ে দিল।

এরপরে পঞ্চরত্ন সমাধিস্থলে থাকা বাউল ও দর্শনার্থীদের থেকে তারা লালন ফকির সম্পর্কে নানা তথ্য জানতে পারলো।

লালন ফকির যে মানবতা ও সাম্যের জন্য কবিতা ও গান রচনা করেছেন তা আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। তিনি আজ বিশ্ব মানবতার প্রতীক। তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক, গীতিকার ও সুরকার, সমাজ সংস্কারক, গায়ক এবং আধ্যাত্মিক সাধকগুরু। ইউনেস্কো ইতোমধ্যেই আমাদের বাউল গানকে বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

পঞ্চরত্ন দেখতে পেল লালনের আখড়াবাড়ির পাশে ঠিক সন্ধ্যার আগে একজন বাউল গাছের নিচে বসে একাকী গান করছেন। তাঁর হাতে একটি একতারা, পায়ের সাথে বাঁধা ঘুঙুর। কখনও তিনি হাতবায়া বাজিয়েও গান গাইছেন। গানের সুরের টানে আশেপাশে থাকা দর্শনার্থীরাও সেখানে গিয়ে যোগ দিল। কিছুক্ষণের জন্য পঞ্চরত্ন হারিয়ে গিয়েছিল এক অজানা সুরের ভাবনালোকে। গানের সাথে পা-মিলিয়ে বাউল তার ইচ্ছামতো নাচের ভঙ্গিও পরিবেশন করেছে, এসময়ে পঞ্চরত্ন বাউলের সাথে তাল মিলিয়ে নাচের ভঙ্গি শিখে নিয়েছে।

বাউল গেয়ে চলেছেন-

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি
কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মনবেড়ি
দিতাম পাখির পায়।।

আট কুঠুরী নয় দরজা আঁটা
মধ্যে মধ্যে ঝরকা কাটা।
তার উপরে সদর কোঠা
আয়নামহল তায়।।

কপালের ফ্যার নইলে কি আর
পাখিটির এমন ব্যবহার।
খাঁচা ভেঙে পাখি আমার
কোন বনে পালায়।।

মন তুই রইলি খাঁচার আশে
খাঁচা যে তোর কাঁচা বাঁশে।
কোন দিন খাঁচা পড়বে খসে
ফকির লালন কেঁদে কয়।।

বাউল সাধনার প্রাণপুরুষ দার্শনিক লালনশাহ ফকির জন্মগ্রহণ করেন ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে। বাংলার জারি, সারি, কীর্তন, পালা, গাজীরগান, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি সকল গানই তাঁকে আকর্ষণ করতো। আশেপাশের গ্রামে যেখানেই গানের আসর বসতো লালনশাহ সেখানে গিয়ে হাজির হতেন। আসরে পরিবেশিত গান শুনেই সংগীতের প্রতি তাঁর ভক্তিভাব আরও বেড়ে যায়।

কৈশোরে পা রাখতেই তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। মায়ের মৃত্যুর পর লালন প্রায় গৃহত্যাগী হয়ে যান। এরপর সিরাজশাহের কাছেই লালনশাহ ফকির প্রথম দীক্ষাপ্রাপ্ত হন। দীক্ষা গ্রহণের পর থেকেই তিনি তাঁর গুরু, গুরু মায়ের সেবায় নিয়োজিত থেকে নিয়মিত সাধুসঙ্গ ও সেবা চালিয়ে যান।

আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্য দিয়ে তিনি নিজ দর্শনকে প্রকাশ করেছেন। লোকজীবনের প্রায় সকল বিষয়ই লালনের গানে আশ্রয় পেয়েছে। মারফতি, ফকিরি, মুর্শিদি, দেহতত্ত্ব, নবীতত্ত্ব, মনশিক্ষা, বিচ্ছেদি, একেশ্বরবাদ, গোষ্ঠগান, রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব, প্রার্থনা, প্রেমতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে তিনি খুব সাবলীলভাবে গানের মাধ্যমে মানুষকে জ্ঞান প্রদান করেছেন।

তাঁর গানের বিষয় হলো মানবপ্রেম। আধ্যাত্মিক সাধনা, দর্শনচিন্তা, মানবতাবাদ, অসাম্প্রদায়িক চেতনার জন্য তাঁর সৃষ্ট বাউল ও মরমি গান প্রতিটি বাঙালির কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। তিনি আমাদের জাতীয় ও লোকজীবনে বাউল গুরু লালনশাহ ফকির নামে পরিচিত।

বাউল গান, নাচ এবং লালন শাহ সম্পর্কে অনেক কিছু জানার পর প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো তারা বন্ধুখাতায় লিখে নিল।

এরপর প্রথমে তারা গেল ষাট গম্বুজ মসজিদ দেখতে। হজরত খানজাহান (রাঃ) পাঁচশ বছরের বেশি সময় আগে এই অপূর্ব কারুকার্য মণ্ডিত মসজিদটি তৈরি করেছিলেন। স্থাপত্যশৈলিতে লাল পোড়ামাটির উপর লতাপাতার অলংকরণে মধ্যযুগীয় স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। এরপর তারা গেল সুন্দরবন দেখতে।

সুন্দরবন

সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনা ও বরগুনা জেলার কিছু অংশ জুড়ে এই বনভূমি অবস্থিত। এই বনের সাতক্ষীরা অংশ থেকে তারা নৌযানে করে যাত্রা শুরু করল খুব সকালেই। নৌযানে থাকা ভ্রমণ সঙ্গী তাদেরকে বলল, ইউনেস্কো ১৯৯৭ সালে সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে সামুদ্রিক স্রোতধারা প্রবাহিত, এরফলে কাদাযুক্ত লবণাক্ত দ্বীপে ম্যানগ্রোভ বনভূমি গড়ে উঠেছে।

সুন্দরবন সমুদ্র উপকূলবর্তী নোনা পরিবেশ সৃষ্ট বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন। সুন্দরী হলো এই বনের প্রধান গাছ, ধারণা করা হয় এই গাছের নাম অনুসারে এই বনের নাম হয় সুন্দরবন। এই বনে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ এবং বন্যপ্রাণী রয়েছে। বিশ্ব বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার এই বনের অন্যতম আকর্ষণ সৃষ্টিকারী প্রাণী।

নৌযানে করে নদীতে চলার সময় সেখানে বসেই তারা দুপুরের খাবার খেয়েছে। চুইঝালে রান্না করা তরকারি আর নদী থেকে ধরা বাগদা চিংড়ির রান্না করা খাবারের স্বাদ তাদের খুব ভালো লেগেছে।

এ সময় দিদিকে পঞ্চরত্ন জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা দিদি আমরা না হয় সুন্দরবন ঘুরে গেলাম এবং অনেক কিছু জানলাম, কিন্তু যে সকল বন্ধু এখানে আসতে পারেনি তারা কি করে এমন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে?

প্রশ্ন শুনে দিদি বেশ আগ্রহের সাথেই বললেন তোমরা গাজীর পটের আদলে অথবা নিজেদের ইচ্ছামতো সুন্দরবন ও বাঘের ছবি আঁকতে পারে এবং নিজেদের এলাকায় যদি কোনো বন থাকে তা ভ্রমন করতে পার। সুন্দরবন ভ্রমণের পর পঞ্চরত্ন এলো ঐতিহাসিক মুজিবনগরে।

মুজিবনগর

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরের সাথে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস। পঞ্চরত্ন মুজিবনগরে গিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেরেছে। এখানে স্থাপিত শিল্পকর্মের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকালীন ইতিহাসের বর্ণনা করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ, পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকারদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ, হানাদার বাহিনী এবং তাদের দোসরদের নিষ্ঠুরতায় গণহত্যার ঘটনা, পাকিস্তানি বাহিনীর আত্নসমর্পণ ইত্যাদি ঘটনা ভাস্কর্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এমন অনেকগুলো নতুন তথ্য তারা বন্ধুখাতায় লিখে নিয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে বুকে ধারণ করে পঞ্চরত্ন যাত্রা করল কীর্তনখোলা নদীর তীরের জনপদ বরিশালের উদ্দেশে।

এই অধ্যায়ে আমরা যা করব –

- বইয়ে দেওয়া নির্দেশনা অনুসারে প্রাকৃতিক উপকরণ দিয়ে রং তৈরি করব।
- বইয়ে দেওয়া সুন্দরবনের ছবিটি পটচিত্রের মতো অথবা নিজের ইচ্ছামতো করে আঁকব। নিজেদের তৈরি রং দিয়ে অথবা পেনসিল, কলম, রংপেনসিল, প্যাস্টেল রং সহ সহজ লভ্য যেকোন রং দিয়ে ছবিটি রং করব।
- বইয়ে দেওয়া লালন শাহ এর গান ‘খাঁচার ভিতর অচিন পাখি’ গানটি খালি গলায় অথবা ‘সা’ স্বর বাজিয়ে গাওয়ার চেষ্ট করব।
- বিষয়বস্ত দেখে পৌরাণিক পট, গাজীর পট, কালিঘাট পট ও সমসাময়িক বিষয়ের পট শনাক্ত করার চেষ্টা করব।
- আমাদের আশেপাশে কোনো পটচিত্রশিল্পী (পটুয়া) অথবা পট প্রদর্শনকারী (কুশীলব বা গায়েন) আছে কিনা তা অনুসন্ধান করব।
- লালন শাহ এর কর্ম, গান সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব।

কীর্তনখোলার পাড়ে ধানশালিকের দেশে

পঞ্চরত্নের এবারের গন্তব্য রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশের জন্মভূমি বরিশালে। পঞ্চরত্নকে বরিশালে ভ্রমণে সহযোগিতা করবে শামস মামার বন্ধু মহসিন রহমান।

নির্দিষ্ট দিনে পঞ্চরত্ন খুলনা বাস স্টেশনে গিয়ে বাসে উঠে বসল। বাসে যেতে যেতে আগুন বরিশাল সম্পর্কে কিছু তথ্য দিল এবং তাদের ভ্রমণ পরিকল্পনা পড়ে শোনাল। বাসের সিটে বসে গুন গুন করে গান গাইতে লাগল সমীর:

আয়রে বাঙ্গালী আয় সেজে আয়,
আয় লেগে যাই দেশের কাজে।

(সংক্ষেপিত)

বাহ! গানটা বেশ ভাল তো, বলল ইরা। এটা কার লেখা গান? আমি এই গানটি আগে কখনও শুনিনি। সমীর বলল এটা চারণ কবি মুকুন্দদাসের গান।

বাস ছাড়ার ফাঁকে গানের এসব বিষয় নিয়ে পঞ্চরত্ন আলোচনা করছিল বাসের সিটে বসে। অবশেষে বাস চলতে শুরু করল বরিশালের উদ্দেশে।

বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, পিরোজপুর, বরগুনা, ঝালকাটি এই ছয়টি জেলা নিয়ে বরিশাল বিভাগ গঠিত। প্রাকৃতিক সম্পদ আর লোকসংস্কৃতির বিশাল উৎস এই বিভাগ। বাসে বসে এই সব আলোচনা করতে করতে পঞ্চরত্ন পৌঁছে গেল বরিশাল শহরে।

বাস স্টেশনে তাদের আমন্ত্রণ জানাতে আসলেন মহসিন সাহেব এবং তাঁর মেয়ে মালিহা। মালিহা ক্র্যাচ ব্যবহার করে। সে ফুল নিয়ে বাবার সাথে বাস স্টেশনে পঞ্চরত্নকে অভ্যর্থনা জানাল। মালিহা দশম শ্রেণির ছাত্রী। সে খুব ভাল গান গায় এবং ছবি আঁকে। স্কুলের সকল সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড মালিহার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

এরই মধ্যে পঞ্চরত্নের সবার সাথে তার বেশ ভাব হয়ে গেল। মালিহা তার করা কিছু জলরং, পোস্টার রং এবং প্যাস্টেল রঙে আঁকা ছবি এবং নকশা পঞ্চরত্নকে দেখাল। তারা ছবিগুলো দেখে বেশ প্রশংসা করল। পঞ্চরত্ন জলরং, পোস্টার রঙে ছবি আঁকার পদ্ধতি সম্পর্কে মালিহার কাছে জানতে চাইল। সে তাদেরকে ছবি আঁকার পদ্ধতি সম্পর্কে জানাবে বলল। এর মধ্যে পঞ্চরত্ন তাদের কল্পনায় স্বদেশ ভ্রমণের সবকিছু বিস্তারিভাবে মালিহাকে জানাল। সেও পঞ্চরত্নের সাথে বরিশাল ভ্রমণে সাথি হয়ে গেল। তারা সবাই মিলে বরিশাল ভ্রমনের একটা পরিকল্পনাও করে ফেলল। সমীর বাসে গাওয়া ‘আমরা মানুষ হতে চাই’ গানটি নিচু স্বরে করছিল। কথা বলার ফাঁকে মালিহা তা খেয়াল করল। সমীরের গান শুনে মালিহা বলল বাহ! তুমি তো বেশ ভালো গান কর। এটা মুকুন্দদাসের খুব বিখ্যাত একটি গান।

সমীর বলল এই গানটা মুকুন্দদাসের এটা জানতাম কিন্তু তাঁর সম্পর্কে আর তেমন কিছু জানা নেই। মালিহা বলল আমাদের ভ্রমণ তালিকায় মুকুন্দদাসের কালিবাড়িও রয়েছে আমরা সেখানে গিয়ে স্থানীয় মানুষদের কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারব। পঞ্চরত্নও বিষটিতে একমত হল।

এর মধ্যে মামি এসে বললেন অনেক বেলা হয়ে গেছে, চলো খেতে চলো। তোমাদের জন্য আমি বরিশালের কিছু ঐতিহ্যবাহী খাবার তৈরি করেছি। খাবার টেবিলে গিয়ে পঞ্চরত্ন খুব খুশি হয়ে গেল। কারণ টেবিলে ছিল কলাপাতায় মাছ ভাজা, নারিকেল দিয়ে হাঁসের মাংসসহ অনেক কিছু।

খেতে খেতে মহসিন মামা বলেন বরিশাল শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত অশ্বিনীকুমার হলে বরিশাল সংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংগঠনের সমন্বয়ে শুরু হয়েছে বিভাগীয় সাংস্কৃতিক উৎসব। এ উপলক্ষ্য বসেছে পক্ষকাল ব্যাপী লোকমেলা। সে মেলায় আজ রাতে যাত্রা পরিবেশিত হবে। আমরা সবাই মিলে যাত্রা দেখতে যাব। মহসিন মামা পঞ্চরত্নের কাছে জানতে চাইলেন তারা আগে যাত্রা দেখেছে কি না। পঞ্চরত্ন জানাল তারা আগে কখনও যাত্রা দেখেনি। তখন মহসিন মামা বলেন তবে তোমাদের যাত্রা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দিই। তাহলে তোমরা যাত্রা ভালভাবে উপভোগ করতে পারবে। এই বলে তিনি যাত্রা সম্পর্কে বললেন--

যাত্রা

বাংলা লোকনাট্যের অন্যতম জনপ্রিয় সাংস্কৃতিকধারার নাম হলো যাত্রা। যাত্রা অর্থ গমন, কোনো বিশেষ বা শুভকাজে গমন করাকে বুঝাতেই এই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাচীনকালে এমন রীতির প্রচলন থাকলেও যাত্রার ভিতর দিয়ে এখানকার মানুষের দেশপ্রেম, মুক্তিসংগ্রাম ও সমাজ সংস্কারের কথা প্রকাশিত হয়েছে। বিংশ শতকের শুরুর দিকে যাত্রায় দেশপ্রেমমূলক কাহিনির সংযোজন ঘটে। কৃষকের কর্মপঞ্জিকার সাথে মিল রেখে বাংলাদেশে শ্রাবণ থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত যাত্রার অভিনয় চলে। যাত্রায় বাদ্যযন্ত্র হিসেবে মন্দিরা, খোল,

বাঁশি, ড্রাম, বেহালা, বাংলা ঢোল, তবলা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

দেশপ্রেম আর নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধারাকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে জাত, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে মানুষ যাত্রার প্রতি ভালোবাসা দেখিয়েছে। যাত্রার মাধ্যমে কথকতা, সংলাপ, নৃত্য, অভিনয়, সংগীত, বাদ্যযন্ত্রের সম্মিলিত প্রয়োগ দেখা যায়। ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য পরিবেশনার মতো যাত্রাও পরিবেশন করা হয় খোলা মঞ্চে। যার চারদিকে দর্শক বসা থাকে। একজন প্রমটার পাণ্ডুলিপি দেখে অভিনেতা/অভিনেত্রীদের সংলাপ বলে দেন। মঞ্চের দুদিক দিয়ে মঞ্চে উঠার জন্য সিঁড়ি থাকে। বাদ্যযন্ত্র নিয়ে যন্ত্রীগণ মঞ্চের বাইরে বসেন। যন্ত্রীদলের সাথে একজন প্রমটার থাকেন, যিনি যাত্রাভিনয় চলাকালিন অভিনেতাদের জন্য সংলাপ বলতে থাকেন।

রাতে পঞ্চরত্ন সবার সাথে অশ্বিনীকুমার হলে যাত্রাভিনয় দেখল। যাত্রা দেখতে দেখতে পঞ্চরত্ন নিজেরাই যাত্রার জগতে হারিয়ে গেল। কল্পনার যাত্রায় তারা নিজেরাই অভিনয় করতে লাগল। এই অপূর্ব ভাল লাগার মধ্য দিয়ে এক সময় যাত্রা শেষ হলো। যাত্রা দেখে সেদিনের মতো তারা বাসায় ফিরল। এর মধ্যে আলোচনা করে তারা ঠিক করল ফিরে গিয়ে নিজেদের পছন্দমতো বিষয় ঠিক করে শ্রেণিকক্ষে এমন একটি পরিবেশনার আয়োজন তারা করবে।

যাত্রা দেখে বাসায় ফিরে রাতে সবাই মাতলেন গভীর গল্পে। গল্পের ফাঁকে সমীরকে মহসিন মামা বললেন মালিহার কাছ থেকে জানলাম তোমরা চারণ কবি মুকুন্দদাস সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। আমরা যদি মুকুন্দদাসের কালিবাড়ি ভ্রমণে যাই তবে কেমন হয়?

সাথে সাথে পঞ্চরত্ন আর মালিহা বলল খুব ভাল হয়, সেখান থেকে আমরা মুকুন্দদাস সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারব। পরের দিন তারা মুকুন্দদাসের কালিবাড়ি ভ্রমণে গিয়ে সেখানকার বাসিন্দাদের সাথে কথা বলে মুকুন্দদাসের বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পারল।

মুকুন্দ দাসের জন্ম ১৮৭৮ সালে ঢাকা জেলায় হলেও তাঁর বেড়ে ওঠা কিন্তু বরিশালে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে অসাধারণ সব গণসংগীত রচনা করে তা মানুষকে গেয়ে শুনাতেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বরিশালে ইংরেজবিরোধী বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। মুকুন্দ দাস গান, কবিতা, নাটক রচনা করে সে আন্দোলনে নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করেন। তাঁকে চারণকবি নামে সবাই জানে। ১৯০৫ সালে তিনি তাঁর প্রথম যাত্রাপালা 'মাতৃপূজা' রচনা করেন। যাত্রার মধ্য দিয়ে সংগ্রামের কাজকে আরও বেগবান করে তোলেন। যাত্রাদল নিয়ে তিনি সারাদেশে ভ্রমণ শুরু করেন। অভিনয়ের মাঝখানে তিনি বক্তৃতার মতো করে সাধারণ মানুষকে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করতেন। একপর্যায়ে ব্রিটিশ পুলিশ 'মাতৃপূজা' যাত্রাপালার পাণ্ডুলিপিকে বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে।

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় মুকুন্দ দাসের গড়া কালীমন্দিরের ব্যাপকভাবে ক্ষতি করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। এখানকার মন্দিরের গায়ে চিত্রশিল্পী প্রেমলালের আঁকা চারণকবি মুকুন্দ দাসের ছবির দেখা মেলে। পঞ্চরত্ন জানতে পারল প্রতি বছর এখানে মুকুন্দ মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এবার পঞ্চরত্ন মহসিন মামার কাছে জানতে চাইল বরিশালে কি কি কারুশিল্প তৈরি হয়?

মহসিন মামা বললেন বরিশালের হস্ত ও কারুশিল্পের রয়েছে নানা রকমের বৈচিত্র্য। বরিশালের প্রতিটি জেলায় রয়েছে হস্ত ও কারুশিল্পের নিজস্ব ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য। যেমন- পিরোজপুরের শোলা শিল্প, পটুয়াখালীর মৃৎশিল্প ও বাঁশ শিল্প, ঝালকাঠির গামছা এবং বরগুনা জেলার হোগলা শিল্প উল্লেখযোগ্য। তবে বরিশালের নারকেলের মালা (খোল) দিয়ে তৈরি হস্ত ও কুটির শিল্প বিখ্যাত। ফেলে দেওয়া প্রাকৃতিক উপকরণ নারকেলের মালা (খোল) কে শৈল্পিকভাবে ব্যবহার করা হয় এই শিল্পে। পঞ্চরত্ন মহসিন মামার সাথে নারকেলের মালা (খোল) দিয়ে কীভাবে পণ্য তৈরি হয় তা দেখতে গেল।

নারকেলের মালা (খোল) দিয়ে তৈরি হস্ত ও কুটির শিল্প

নারকেল খাওয়ার পর তার মালা (খোল) অপ্রয়োজনীয় বস্তুতে পরিণত হয়। কিন্তু বর্তমানে নারকেলের বাই প্রোডাক্টস অর্থাৎ নারকেলের উচ্ছিষ্ট মালা দিয়ে তৈরি হয় বিভিন্ন শোপিস বা গৃহসজ্জার সামগ্রী। নারকেলের মালা (খোল) ছাড়াও এসব শোপিস বানাতে আরও ব্যবহার করা হয় পাট, সুতা, বাঁশ, কাঠ, প্রভৃতি উপকরণ। এসব উপকরন দিয়ে তৈরি হয় চাবির রিং, পাখি, ফুল, কচ্ছপ, হাতি, ফুলদানি, মোমদানি, টেবিলল্যাম্পসহ নানা ধরনের নান্দনিক শোপিস। এই নারকেলের খোল ব্যবহার করা হয় বাদ্যযন্ত্র একতারায়। তাছাড়া নারকেলের খোল দিয়ে তৈরি জামার বোতাম পোশাককে নান্দনিক করে তোলে। নারকেলের মালা দিয়ে তৈরি এই সব পণ্যের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে সারা দেশে। হস্ত ও কুটির শিল্পের নতুন উদ্যোক্তারা নারকেলের মালা দিয়ে আরও নতুন নতুন পণ্য তৈরি করছে।

পঞ্চরত্ন দেখল নারকেলের মালা (খোল) দিয়ে কিভাবে সুন্দর হস্তশিল্প তৈরি হয়। আকাশ বলল আমরাও এই রকমই কিছু করব। আমরা নিজেদের আশপাশের পরিত্যক্ত উপকরণ/ সামগ্রী দিয়ে নতুন পণ্য তৈরি করার চেষ্টা করব। আমাদের এই কাজটির নাম হবে- ‘নবরূপ’

‘নবরূপ’ এ যেভাবে আমরা পরিত্যক্ত জিনিস দিয়ে নতুন শিল্প সামগ্রী তৈরি করব

নবরূপ' কাজটি করার জন্য আমাদের সৃজনশীল বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে হবে। এই কাজটির মধ্য দিয়ে আমরা ঘর সাজানোর পণ্য তৈরি করতে পারব। সাথে সাথে পরিত্যক্ত জিনিসের পুনর্ব্যবহার করতে পারব। এতে করে পরিবেশ দূষণরোধ করার ক্ষেত্রে আমরা কিছুটা ভূমিকা রাখতে পারব।

- এই কাজ করার জন্য প্রথমে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে এমন কিছু জিনিস যা কিনা অব্যবহৃত/ফেলে দেওয়া/পরিত্যক্ত এবং যা সহজেই আশেপাশে থেকেই পাওয়া যাবে। যেমন—প্লাস্টিকের বোতল/প্লেট/চামচ/কাপ, পাটের দড়ি, মোটা কাগজের প্যাকেট, পুরনো রঙিন কাপড়, পুরোনো খবরের কাগজ, বিভিন্ন রঙের চকচকে মোড়ক ইত্যাদি।
- কাজটি করার জন্য কিছু সরঞ্জাম দরকার হবে। যেমন—কাঁচি/এন্টি কাটার, আঠা/গাম, রং ইত্যাদি ।
- নিচের ছবিতে দেওয়া পণ্যের নমুনাগুলো ভালভাবে দেখব। কীভাবে একটি পরিত্যক্ত জিনিস দিয়ে নতুন সৃজনশীল পণ্য তৈরি করা হয়েছে তা ছবিগুলোতে ধারাবাহিকভাবে দেওয়া আছে যা দেখে আমরা ধারণা নিতে পারি।
- এই ছবি থেকে ধারণা নিয়ে আমাদের নিজেদের সংগৃহীত জিনিস দিয়ে নতুন পণ্য তৈরির পরিকল্পনা ও খসড়া নকশা তৈরি করতে হবে। পরিকল্পনা করার সময় আমরা শিক্ষক এবং সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করব।
- কাজ করার সময় নিরাপত্তার বিষয়টি আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে। স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ নয় এমন কোনো জিনিস আমরা ব্যবহার করব না।
- নতুন পণ্য তৈরি সম্পন্ন হলে শ্রেণি কক্ষে তা প্রদর্শন করব।

নতুন পন্য

এবার পঞ্চরত্নের বরিশাল ভ্রমণে বের হওয়ার পালা। আকাশ বলল ঘুরতে বের হবার আগে আমরা মালিহা আপুর কাছ থেকে জলরং ও পোস্টার রঙে ছবি আঁকার করণকৌশলটা শিখে নিতে চাই। আকাশের কথার উত্তরে মালিহা বলল আমি এসব মাধ্যমের করণকৌশল শিখেছি আমার বাবার এক শিল্পী বন্ধুর কাছ থেকে। আমি যতটুকু জানি তা জানাতে পারব। বাকিগুলো তোমাদের অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্তে আনতে হবে।

এবার আমরা জানব জলরং ও পোস্টার রঙে কিভাবে ছবি আঁকতে হয়-

জলরং ছবি আঁকার একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। পানি বা জলের সাথে রং মিশিয়ে আঁকা হয় বলে একে জল রং বলে এর ইংরেজি নাম (water colour)।

জলরঙের ছবি আঁকার প্রধান উপকরণ হলো রং। জলরং সাধারণত টিউবে কিনতে পাওয়া যায়। টিউব ছাড়া প্যান/কেক আকারেও জলরং কিনতে পাওয়া যায়।

জলরঙের প্রয়োজনীয় আরেকটি উপকরণ হলো তুলি। সাবল নামক একধরনের প্রাণীর লেজের লোম দিয়ে তৈরি (sable hair brush) তুলি জলরঙের জন্য খুব উপযোগী। তাছাড়া কাঠবিড়ালীর লোম দিয়ে তৈরি (squirrel hair brush) তুলিসহ বিভিন্ন রকমের তুলি জলরঙের জন্য ব্যবহার করা হয়। তবে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রাণির লোমের পরিবর্তে বর্তমানে সিনথেটিক উপাদান দিয়ে তৈরি অনেক ভালমানের জলরঙের তুলি পাওয়া যায়। জলরঙের জন্য সাধারণত গোল (round) চ্যাপ্টা (flat) তুলি ব্যবহার করা হয়।

গোল তুলিগুলো— ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ ইত্যাদি নাম্বারে পাওয়া যায়। তুলির নাম্বার বাড়ার সাথে সাথে তার সাইজ মোটা হতে থাকে। চ্যাপ্টা তুলির ক্ষেত্রে মাপটি হয় ইঞ্চিতে যেমন— আধা ইঞ্চি, ১ ইঞ্চি, ২ ইঞ্চি, ৩ ইঞ্চি, ৪ ইঞ্চি ইত্যাদি।

জলরঙের জন্য হাতে তৈরি কাগজ (handmade paper) বিশেষভাবে উপযোগী। তাছাড়া কার্টিজ পেপারসহ অন্যান্য কগজেও এই মাধ্যমে ছবি আঁকা হয়। এছাড়া জলরঙের জন্য পানি রাখার পাত্র আর রং গোলানোর জন্য কালার প্যালেট প্রয়োজন হয়।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

জলরঙের টিউব প্যান/কেক

বিভিন্ন রকমের জলরঙের তুলি

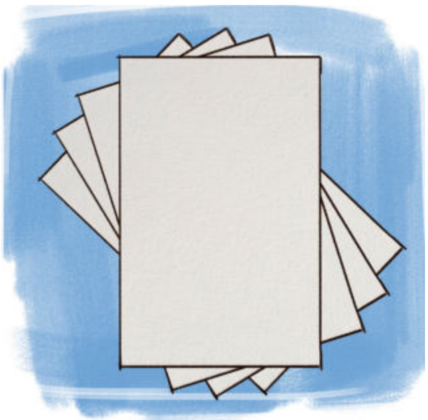

জলরঙের কাগজ

পানি রাখার পাত্র আর রং গোলানোর জন্য কালার প্যালেট

প্রথমে কাগজটি ছবি আঁকার বোর্ডে ভালভাবে ক্লিপ অথবা টেপ দিয়ে আটকে নিতে হবে। তারপর বিষয়বস্তু যেমন-

জড়জীবন, দৃশ্য, অবয়বসহ যে কোনো বিষয়ের হালকা ড্রইং করে নিতে হবে। তারপর পানি দিয়ে কাগজটি ভিজিয়ে নিতে হবে। এই ক্ষেত্রে চ্যাপ্টা তুলি ব্যবহার করা যেতে পারে। কাগজে পানিটা হালকা শুষে নিয়ে আর্দ্র ভাবটা থাকা অবস্থায় রং দিতে হয়। এই পদ্ধতির জলরং কে ভেজা (wet) পদ্ধতি বলে।

কাগজে রং দেওয়ার আগে তা প্যালেটে প্রয়োজনমতো পানি দিয়ে ভালভাবে গুলিয়ে নিতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে জলরঙের সব রঙের ঘনত্ব একই রকমের না। জলরঙে রঙের সাথে পানির পরিমাণ বাড়িয়ে রংকে গাঢ় থেকে হালকা করে ছবিতে ব্যবহার করা হয়। কোন রং গুলোতে কি পরিমাণ পানি দিতে হবে তা অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ত করতে হবে।

কোনো কোনো শিল্পী কাগজ না ভিজিয়েও সরাসরি কাগজে রং দিয়ে ছবি আঁকেন। জলরঙের এই পদ্ধতিকে শুকনো (dry) পদ্ধতি বলে।

জলরং পানিতে পাতলা করে গুলিয়ে কাগজে লাগানো হয়। প্রথম স্তরের (first wash) রং লাগানোর একটু পর আর্দ্র থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় স্তরের (second wash) রংটা লাগানো হয়। এই ভাবে একটা স্তরের উপর আরেকটা

স্তর (wash) দিয়ে হালকা থেকে প্রয়োজনমতো ধীরে ধীরে রং গাঢ় করা হয়, পরে সূক্ষ্ম (detail) কাজ করে ছবি শেষ করা হয়।

বিষয়ের হালকা ড্রইং

প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের রং লাগানোর পর

ধাপে ধাপে সম্পন্ন করা একটি জলরঙে আঁকা চিত্রকর্ম

জলরঙের ছবিগুলোতে দুই রকমের চরিত্র দেখতে পাওয়া যায় স্বচ্ছ (transparent) অস্বচ্ছ (opaque)। স্বচ্ছ পদ্ধতিতে রঙের প্রায় প্রতিটা স্তর দেখা যায়। অস্বচ্ছ পদ্ধতিতে রঙের কোনো স্তর দেখা যায় না। জলরঙে ছবি আঁকার ক্ষেত্রে স্বচ্ছ (transparent) পদ্ধতিকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়।

পোস্টার রঙে ছবি আঁকার করণকৌশলও জলরঙের মতো। তবে পোস্টার রঙের ক্ষেত্রে অস্বচ্ছ (opaque) পদ্ধতিতে ছবি আঁকা হয়। পোস্টার রং নকশা বা অলংকরণের জন্য বেশি ব্যবহার করা হয়।

আমাদের দেশের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনও জলরঙে অনেক ছবি এঁকেছেন। ১৯৩৮ সালে সর্বভারতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনীতে জয়নুল আবেদিন তাঁর জলরঙের ছবির জন্য স্বর্ণপদক লাভ করেন।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জলরঙে আকাঁ চিত্রকর্ম

সেদিনের মতো পঞ্চরত্নের জলরং আর পোস্টার রঙের অনেক অনুশীলন হল। পঞ্চরত্ন এবং মালিহা ঠিক করল তারা বরিশালের যেসব স্থানে ভ্রমণে যাবে সেখানের কিছু দৃশ্য তারা জলরঙে আঁকার চেষ্টা করবে। সাথে সাথে বিভিন্ন স্থাপনা থেকে সংগ্রহ করা নকশাগুলো পোস্টার রঙে আঁকার চেষ্টা করবে।

পঞ্চরত্নের এবারের ভ্রমণের গন্তব্য যথাক্রমে অক্সফোর্ড মিশন গির্জা, কড়াপুর মিয়াবাড়ি মসজিদ এবং কালেক্টরেট ভবন, শাপলার বিল এবং কুয়াকাটার সমুদ্র সৈকত।

অক্সফোর্ড মিশন গির্জা

বরিশাল নগরের বগুড়া রোডের পাশে লাল ইটের তৈরি অক্সফোর্ড মিশন গির্জাটি অবস্থিত। স্থানীয় মানুষের কাছে এটি 'লাল গির্জা' নামে পরিচিত। জীবনানন্দ দাশ সড়কের পাশে বরিশাল নগরীর বগুড়া রোডে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে লাল গির্জাটি। যা প্রায় ১১৪ বছরের প্রাচীন। গির্জাটি একতলা হলেও এর উচ্চতা প্রায় চারতলার সমান। কাঠের তৈরি ছাদ আর মেঝেতে সুদৃশ্য মার্বেলের ব্যবহার এই স্থাপনাকে করেছে অনন্য। এই লাল গির্জা জড়িয়ে আছে কবি জীবনানন্দ দাশের বিখ্যাত কবিতা 'আকাশে সাতটি তারা' কবিতাটির সাথে।

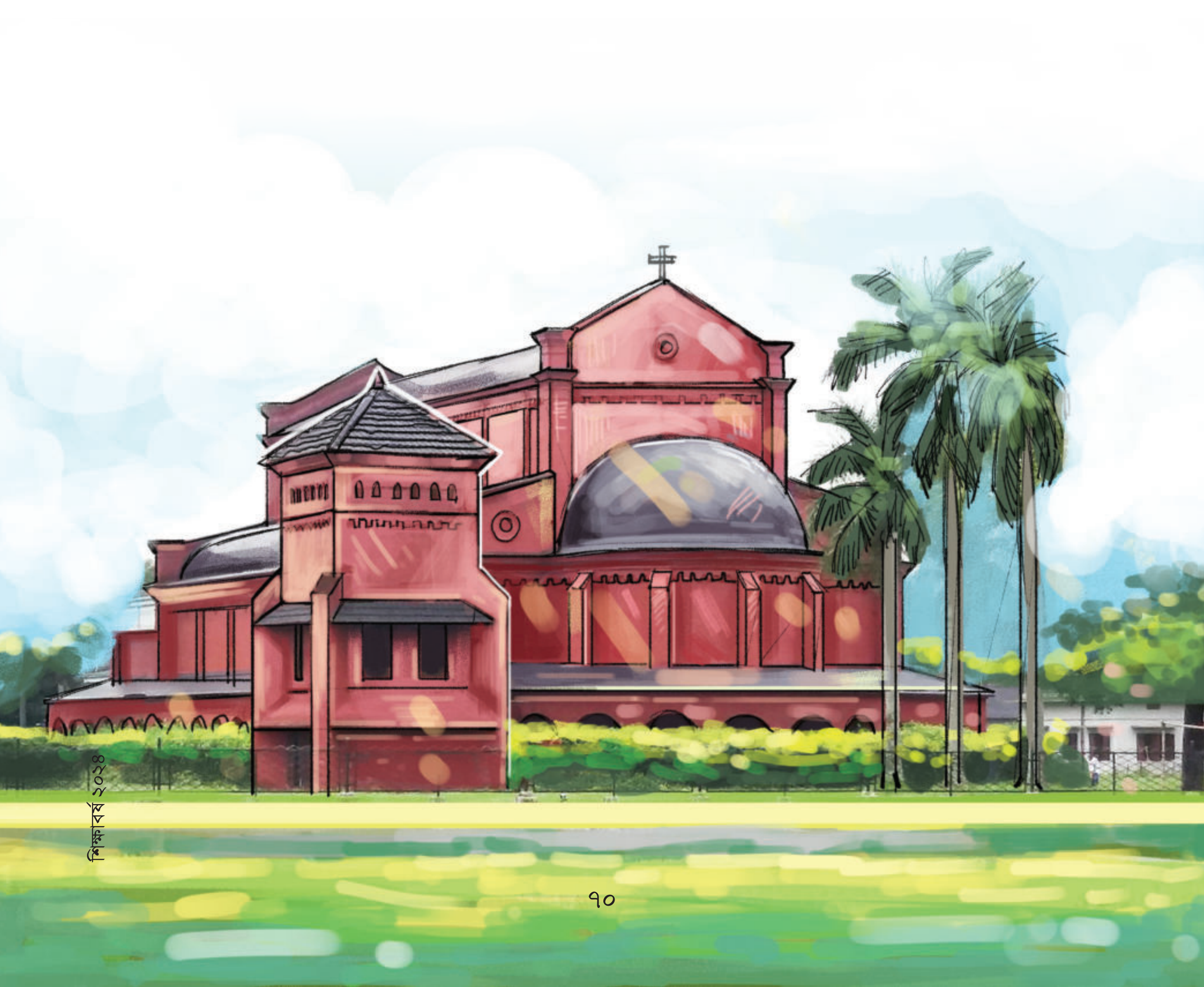

শাপলার বিল

পঞ্চরত্নের এবারের গন্তব্য বরিশালের উজিরপুর উপজেলার সাতলা গ্রামের শাপলার বিল। এই যেন রূপকথার ফুলের রাজ্য। এই বিলে যতটুকু দৃষ্টি যায় শুধু শাপলা আর শাপলা। তিন ধরনের শাপলার দেখা মিলবে এই বিলে লাল, সাদা এবং বেগুনি। সেখানে পৌঁছে পঞ্চরত্ন নৌকাযোগে শাপলা বিলে ভেসে বেড়াতে লাগল। এখানকার শাপলা ফুলের দৃশ্য যে কাউকে মুগ্ধ করবে। বাংলাদেশের জাতীয় ফুল হওয়ায় এটির প্রতি আলাদা ভালোবাসা সকলেরই রয়েছে। নৌকায় বসে তারা শাপলা-শালুকের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে দু' নয়ন ভরে উপভোগ করতে লাগল। এই অপুরূপ দৃশ্যটি তারা জলরং আর পোস্টার রঙে আঁকার চেষ্টা করল। জলরঙে ছবি আঁকার বিষয়ে মালিহা তাদের সহযোগিতা করল।

এরপর তারা গেল কুয়াকাটার সমুদ্র সৈকতে। 'সাগরকন্যা' নামে পরিচিত পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখা যায়। এই সৈকতের কাছেই রয়েছে রাখাইন পল্লী। কুয়াকাটা হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের তীর্থস্থান। এখানে 'রাস পূর্ণিমা' এবং 'মাঘী পূর্ণিমা' উৎসবে বহু পুণ্যার্থী আসেন। সৈকতের পাশে অবস্থিত রয়েছে ঐতিহ্যবাহী বৌদ্ধ মন্দির। যেখানে রয়েছে প্রায় সাঁইত্রিশ মণ ওজনের অষ্ট ধাতুর তৈরি ধ্যানমগ্ন

বুদ্ধের মূর্তি। কুয়াকাটার সমুদ্র সৈকতে তারা জলরং আর পোষ্টার রঙে ছবি আঁকল।

এরপর পঞ্চরত্ন গেল কীর্তনখোলা নদীর পাড়ে। এই নদীর রূপ অন্তরে ধারণ করে এবার তাদের বিদায় নেবার পালা। এবার পঞ্চরত্ন যাবে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়।

মহসিন মামাও পঞ্চরত্নের সাথে ঢাকা যাবে সেখানে তিনি বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন এর একটি কর্মশালায় অংশগ্রহণ করবেন। পঞ্চরত্ন মামার কাছে কর্মশালাটির বিষয়ে জানতে চাইলে মামা বলেন দেশের সম্পদ ব্যবহার করে বিশ্ববাজারের উপযোগী নতুন নতুন হস্ত ও কারুপণ্য তৈরিই এই আবাসিক কর্মশালার মূল বিষয়।

সেদিন রাতে মহসিন মামাসহ পঞ্চরত্ন বেরিয়ে পড়ল ঢাকার উদ্দেশে। সব বিষয়ে সহযোগিতার জন্য পঞ্চরত্ন কৃতজ্ঞতা জানাল মালিহাকে। সমগ্র ভ্রমণের বিস্তারিত সবকিছু মালিহাকে লিখে জানাবে বলল পঞ্চরত্ন। পরিবারের সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তারা মামার সাথে রওয়ানা হলো বরিশালের লঞ্চঘাটের উদ্দেশে।

এই অধ্যায়ে আমরা যা করব –

- বইয়ে দেওয়া নির্দেশনা অনুসারে পরিত্যক্ত জিনিস দিয়ে 'নবরূপ' কাজটি করব। তৈরি পণ্যগুলো শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করব।
- বইয়ে দেওয়া নির্দেশনা অনুসারে জলরং এবং পোস্টার রং অনুশীলন করব। বইয়ে দেওয়া শাপলার বিল ছবিটি জলরং অথবা পোস্টার রঙে আঁকার চেষ্টা করব।
- সামাজিক বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করার লক্ষ্যে শ্রেণিতে নিজেদের ইচ্ছেমতো সহজ সরলভাবে দলগত অভিনয় আয়োজনের চেষ্টা করব।
- মুকুন্দ দাস এর কর্ম, গান সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব।

বুড়িগঙ্গার স্রোতে ভাসাই ভেলা

ঢাকাগামী নির্ধারিত লঞ্চে উঠার জন্য মহসিন মামার সাথে পঞ্চরত্ন গেল বরিশাল লঞ্চঘাটে। রাতের বেলায় নদীর জলের উপর ঢাকাগামী লঞ্চগুলাকে মনে হচ্ছিল ভাসমান আলোর দ্বীপ। বরিশাল লঞ্চঘটে গিয়ে এমন দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে গেল। সমগ্র এলাকা জুড়ে মানুষের কোলাহল। এই যেন রাতের বেলার শহর। ভ্রমণপিপাসু পঞ্চরত্ন আবার বাংলাদেশের মানচিত্র খুলে বসল। তারপর কল্পনার যাত্রা শুরু হলো ঢাকার উদ্দেশে।

লঞ্চের সাইরেন বেজে উঠল ভোঁ ভোঁ করে। ভোরবেলা মামা এসে দাঁড়ালেন লঞ্চের রেলিং এর ধারে। পরক্ষণেই পঞ্চরত্ন পাশে এসে দাঁড়াল। শুভ্র নির্মল সকালে বুড়িগঙ্গার সৌন্দর্য দেখে তারা মোহিত হলো।

সারি সারি লঞ্চ, স্টিমার, নৌকার ভিড় ঠেলে লঞ্চটি তীরে এসে ভিড়ে চারশত বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক ঢাকা শহরের তীরে।

ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, গাজীপুর, গোপালগঞ্জ, টাঙ্গাইল, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, রাজবাড়ী, শরীয়তপুর এই তেরোটি জেলা নিয়ে ঢাকা বিভাগ।

ঢাকা শহরে মহসিন মামা পঞ্চরত্নকে নিয়ে আসলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের এক শিক্ষক বন্ধুর বাসায়। যিনি একেধারে একজন চিত্রশিল্পী ও শিল্প সংগঠক। মামার বন্ধুকে পঞ্চরত্ন নাম দিল শিল্পী মামা।

যেহেতু মহসিন মামা আবাসিক কর্মশালায় থাকবে সেহেতু পঞ্চরত্ন থাকবে শিল্পী মামার বাসায়।

পঞ্চরত্নকে শিল্পী মামা জানালেন, আজ সন্ধ্যায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে কিশোরগঞ্জ থেকে আসা একটি জারি দলের গান এবং নাচের পরিবেশনা রয়েছে। আমরা সেখানে যাব এবং জারি শিল্পীদের সাথে কথা বলে জারি গান ও নাচ সম্পর্কে জানব। এই কথা শুনে সমীর মহা উৎসাহে বলল এবার তাহলে স্বচক্ষে আমরা জারি গান ও নাচের পরিবেশনা দেখতে পাব।

পুরো সন্ধ্যাটা এক ভাললাগা অনুভূতি নিয়ে তারা জারি গান ও নাচের পরিবেশনা উপভোগ করল। কি বলিষ্ঠ পরিবেশনা ছিল দলের সব সদস্যের। অবশেষে এলো সে প্রতীক্ষিত ক্ষণ। জারি দলের প্রধানের সাথে শিল্পী মামা পঞ্চরত্নকে পরিচয় করিয়ে দিল। তিনি তাদেরকে জারি গান ও নাচ সম্পর্কে বিস্তারিত বললেন।

জারিনাচ

বাংলাদশের লোকসংস্কৃতির একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনা রীতি হল জারি গান ও জারি নাচ। জারি শব্দের অর্থ বিলাপ বা ক্রন্দন। এই শব্দটির উৎপত্তি ফার্সি ভাষা থেকে। এটি একটি গীতি আখ্যানমূলক পরিবেশনা রীতি। ইসলাম ধর্মের ইতিহাসের কারবালা যুদ্ধের বীরত্ব ও বিয়োগাত্মক কাহিনি এই পরিবেশনা রীতির মুল উপজীব্য বিষয়। বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জে এই পরিবেশনা দেখা যায়। সাধারণত মহররম মাসে এটি পরিবেশিত হয়ে থাকে। জারি গান নাচ সহযোগে পরিবেশিত হয়।

জারিগান কারবালার শোকাবহ ঘটনা কেন্দ্রিক হলেও বর্তমানে সামাজিক, রাজনৈতিক ঘটনাও জারিগানের বিষয় হিসেবে দেখা যায়। অর্থাৎ অঞ্চলভেদে জারি গানের বিষয় বৈচিত্র্য দেখা যায়। তবে, মূলত মহররম ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছোটো আকারে গাওয়া হয় মর্সিয়া। জারি গান গাওয়া হয় বিস্তৃত সুরে। মহররম ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের মেলা, উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জারিগান ও জারিনাচ পরিবেশিত হয়ে থাকে।

এটি একটি দলগত নৃত্য। শিল্পী সংখ্যা ৮-৯ জন বা তারও অধিক হতে পারে। জারিনাচ পরিবেশনার সময় মূলগায়েন সাদা রঙের পাঞ্জাবী, পাজামা এবং মাথায় লালসালুর পটকা বেঁধে রাখেন এবং দোহার বা খেলোয়াড়গণ সাদা রঙের ধুতি বা পাজামা ও স্যান্ডোগেঞ্জি পরিধান করেন।

কোমরে, বাম হাতের কব্জিতে, মাথায় লালসালুর পটকাবন্ধ, গলায় সবুজ স্কার্ফ, পায়ে ঘুঙ্গুর আর দুই হাতে সাদা, সবুজ বা লালরঙের রুমাল রাখেন। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে নাচের তাল রাখার জন্য পায়ে ঘুঙ্গুর ও নাচের গতি পরিবর্তনের জন্য মূল গায়েন বাঁশি ব্যবহার করে থাকেন।

সাধারণত সমতল ভূমিতে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে জারিনাচ করে থাকে। একজন মূল গায়েন, একজন সহযোগী গায়েন ও একদল নৃত্যকার বা দোহার নাচ পরিবেশন করেন। মূল গায়েন ও সহযোগী গায়েন সাধারণত বৃত্তের বাইরে থাকেন, মাঝে মাঝে শুধুমাত্র মূল গায়েন বৃত্তের ভেতরে কেন্দ্রে অবস্থান করেন। মূলগায়েন মূলপালা শুরু করার আগে উপস্থিত দর্শকদের উদ্দেশ্যে আহ্বানমূলক কথা বলেন। এরপরে শুরু হয় বন্দনাগীতি। বন্দনাগীতির ধুয়ো টেনে টেনে দোহার গোলাকার ঘুরে ঘুরে নৃত্য করেন। ধুয়ো বা ধুয়া হলো গানের যে পদ দোহারগণ বার বার গায় বা পুনরাবৃত্তি করেন। আর মূল গায়েন বন্দনাগীতির শেষে এসে সুর ঠিক রেখে উচ্চস্বরে বলে ওঠেন- 'বেশ করো ভাই'। এভাবে মূলপালা শুরু হয়।

যেভাবে আমরা জারি নাচ অনুশীলন করতে পারি

জারিনাচ অনুশীলনের জন্য যে বিষয়গুলো জানা প্রয়োজন, সেগুলো হল- ভঙ্গি, পদভঙ্গি, হস্তভঙ্গি ও মুখভঙ্গি

ভঙ্গি

শিল্পীগণের ভঙ্গি হয় বলিষ্ঠ।

পদভঙ্গিঃ

এই পরিবেশেনা সময় মূল লক্ষ্য থাকে পদবিন্যাসের মাধ্যমে গানের তালে তালে চক্রাকার আকৃতি মেনে চলা। তবে তাদের মূল পদভঙ্গি হল- পদচলনের গতিবিধি সবসময় ডান দিকে হবে। এবার সকলে বৃত্তের ভেতর মুখ করে দাঁড়াব। এরপর ১, ২, ৩, ৪ সমান ছন্দে ডান দিকে যাব। ১ এ ডান পা, ২ এ বাম পা, ৩ এ ডান পা, ৪ এ বাম পা ব্যবহার করে চক্রের পথে চলব। ডান পা একবার বৃত্তের ভেতরে ,আরেকবার বৃত্তের বাইরে রাখব। আর বাম পা জায়গা পরিবর্তনের সাথে সাথে বৃত্তের পথ মেনে চলব অর্থাৎ বাম পায়ের ওপর থাকবে বৃত্তের দিক নির্দেশনার ভার।

ছন্দ	পদচলন
১	ডান
২	বাম
৩	ডান
৪	বাম

হস্তভঙ্গি

হস্তভঙ্গি করার জন্য লাল বা সাদা অথবা সবুজ রঙের রুমাল দুইহাতে বেঁধে নিয়ে দুইহাত ডান পায়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে একবার ভেতরে আরেকবার বাইরে ছুঁড়ে দেয়। দ্রুত লয়ের সময় হাতে তালিও দেয়া যেতে পারে।

মুখভঙ্গি

বর্ণনাত্মক এই পরিবেশনারীতিতে একটি অন্তর্নিহিত ভাব রয়েছে। মুখভঙ্গি অনুশীলন করে, সেই ভাব প্রকাশ করা যায় খুব সহজেই। সেই পরিবেশনা সবচেয়ে প্রাঞ্জল হয়, যে পরিবেশনায় গানের কথার ভাব মুখের অভিব্যক্তির মাধ্যমে দর্শকের কাছে প্রকাশ পায় এবং দর্শকের মনেও একই অনুভূতির সঞ্চার করে। মুখভঙ্গি হিসেবে বীর রস ও করুণ রস দেখা যায়।

দৃষ্টিভঙ্গি

আমাদের অসংখ্য না বলা কথা প্রকাশ পায় চোখের দৃষ্টিতে। অর্থাৎ মানুষের মনের ভাব প্রকাশের অন্যতম প্রধান প্রকাশমাধ্যম- দৃষ্টিভঙ্গি। বীর ও শোকের ভাব প্রকাশ করার জন্য এবার আমরা দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করব।

জারি দলের প্রধানের সাথে আলোচনার সময় দলের অন্যান্য সদস্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে পঞ্চরত্নকে জারিনাচের বিভিন্ন ভঙ্গির সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। জারি দলের সকল সদস্যকে কৃতজ্ঞতা আর ভালবাসা জানিয়ে পঞ্চরত্ন বিদায় নিয়ে বাসায় ফিরে এল। রাতে বাসায় ফিরে পঞ্চরত্ন আর শিল্পী মামার অনেক আলোচনা হলো আজকের জারি দলের পরিবেশনা নিয়ে।

কথার ফাঁকে শিল্পী মামা বললেন কাল তোমাদের নিয়ে যাব পুরান ঢাকায়। সেখানে তোমরা বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় শিল্পধারার সাথে পরিচিত হতে পারবে। সেটি হলো আমাদের দেশের রিকশা পেইন্টিং। এই যেন এক চলমান শিল্পের জগৎ। পঞ্চরত্ন জিজ্ঞেস করল আমরা কি সেখানে রিকশা আর্টের শিল্পীদের সাথে কথা বলতে পারব? তাদের ছবি আঁকার করণকৌশল সম্পর্কে জানতে পারব? পঞ্চরত্নের প্রশ্ন শুনে শিল্পী মামা হেসে উত্তর দিলেন অবশ্যই পারবে। ঐ এলাকার প্রায় সব শিল্পীর সাথে আমার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে। তারা অবশ্যই তোমাদের জানার বিষয়ে সহযোগিতা করবে।

পরের দিন তারা তিনটি রঙিন রিকশায় চড়ে এল পুরান ঢাকার বকসিবাজার এলাকায়। এই এলাকায় রিকশা আর্টের কয়েকজন শিল্পী বসবাস করেন। সেখানে তারা একজন শিল্পীর বাসায় গেলেন। বাসার ভেতরের ছোট একটি রুমে শিল্পী বসে ছবি আঁকছিলেন। তারা যেতেই শিল্পী আমাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন। শিল্পীর সাথে পঞ্চরত্ন পরিচিত হয়ে শুরু করল দীর্ঘ আলাপ। পঞ্চরত্নের প্রশ্ন অনুসারে শিল্পী একে একে বলে চললেন রিকশা আর্টের ইতিহাস ছবি আঁকার করণকৌশলহ সবকিছু। তিনি বললেন আমরা হলাম রিকশা আর্টের দ্বিতীয় প্রজন্মের শিল্পী।

রিকশা পেইন্টিং

এই দেশের মানুষ প্রতিনিয়ত বসবাস করেছে শিল্পের সাথে। যাদের হাত দিয়ে রচিত হয়েছে এই দেশের হাজার বছরের লোকশিল্পের। তাদের ছিল না কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বংশ পরম্পরায় এই সব স্থানীয় লোক শিল্পীরা রচনা করেছেন এই ইতিহাস। যা আজ আমাদের শিল্প ও সংস্কৃতির মূল শিকড়। তেমনি এক দল স্বশিক্ষিত শিল্পীর হাত দিয়ে পঞ্চাশের দশকে রচিত হয়েছে এই দেশের রিকশা পেইন্টিং এর ইতিহাস। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত এই তিন চাকার যানবাহনকে নিজেদের শৈল্পিক চিন্তা দিয়ে প্রতিনিয়ত রাঙিয়ে যাচ্ছেন এই সব শিল্পী। এই যেন হাজার বছরের লোকশিল্পের এক নতুন সূচনা।

একটি রিকশায় অনেকগুলো অংশ থাকে যার প্রত্যেকটি অংশ তৈরির জন্য আলাদা আলাদা কারিগর রয়েছে। তার মধ্যে রিকশা পেইন্টারও রয়েছে। এই সব শিল্পী মূলত রিকশার পেছনের পাতলা টিনের শিটের ওপর ছবি আঁকেন। সময়ের সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে পরিবর্তন হয়েছে রিকশা পেইন্টিং এর ছবির বিষয়বস্তুতে।

প্রথম দিকে রিকশা পেইন্টিং এর বিষয়বস্তুতে প্রাধান্য ছিল নায়ক, নায়িকার ছবি। এরপরে প্রাধান্য পায় রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে আঁকা কাল্পনিক শহরের ছবি। এক সময়ে রিকশা পেইন্টিং এ মানুষ আঁকা বন্ধ হয়ে যায়। সে সময় শিল্পীরা মানুষের পরিবর্তে বিভিন্ন পশুপাখি আঁকা শুরু করেন। যেমন—বাঘ বসে সেলাই করছে সেলাই মেশিনে। শিয়াল করছে রাস্তার ট্রাফিক কন্ট্রোল। খরগোশ ছানা চলেছে স্কুলে পিঠে ব্যাগ নিয়ে ইত্যাদি কাল্পনিক বিষয় উঠে আসে রিকশা শিল্পীদের ছবিতে।

তাছাড়া—বোরাক, দুলদুল, আরব্য রজনীর রাজপ্রাসাদ, আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ ও দৈত্য, তাজমহল, লন্ডন ব্রীজ, আইফেল টাওয়ারসহ দেশ বিদেশের কাল্পনিক ছবি এই সময় রিকশা পেন্টিং এ স্থান পায়।

স্বাধীনতার পরে রিকশা পেইন্টিং এ উঠে আসে স্মৃতিসৌধ, সংসদ ভবন, শহিদ মিনারসহ মুক্তিযুদ্ধের নানা দৃশ্য। বর্তমান সময়ে যমুনা সেতু, পদ্মা সেতু, ব্যস্ত শহরের দৃশ্য যেখানে ফ্লাইওভার রাস্তা ও বিমানবন্দর একসাথে আঁকা আছে, মৎস্য কন্যা, নদী আর গ্রাম ইত্যাদি বিষয় উঠে এসেছে। এছাড়া শিল্পীরা রিকশা অলংকরণের জন্য বিভিন্ন ফুল, লতা, পাতা, ময়ূর, হাঁস ইত্যাদি ছবি আঁকেন। এভাবে সময়ের পরিবর্তনের এক অঙ্কিত দলিল হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের এই রিকশা আর্ট।

স্মৃতিসৌধ

শহিদ মিনার

রিকশা আর্টের শিল্পীরা রিকশার হুডের পেছনের অংশ এবং পেছনের চাকার উপরের গোল অংশসহ বিভিন্ন স্থানে অলংকরণের জন্য আল্লাহু, মা, ধন্যবাদসহ বিভিন্ন ধরনের লিখা ব্যবহার করেন যা তাদের নান্দনিক

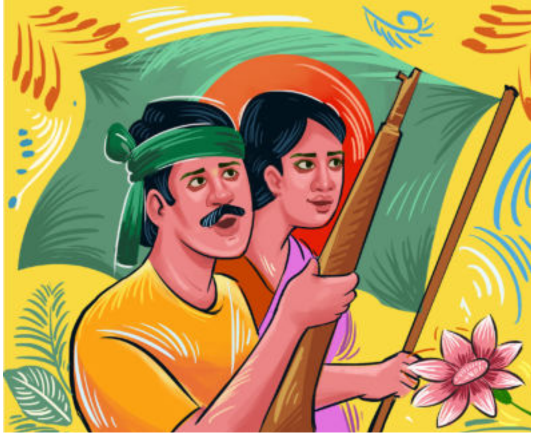

মুক্তিযুদ্ধের ছবি

ফুল, লতা, পাতা

ক্যালিগ্রাফির প্রকাশ।

দেশের এক একটি রিকশা যেন এক একজন শিল্পীর হাতে আঁকা চলমান শিল্পকর্ম। দেশ বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে আমাদের দেশের রিকশা পেইন্টিং। যা নিঃসন্দেহে আমাদের দেশের শিল্প ও সংস্কৃতির

জন্য সম্মানের বিষয়। বাংলাদেশের রিকশা আর্টে দু'ধরনের অঙ্গসজ্জা দেখা যায়। প্রথমটা হচ্ছে রিকশা অ্যাপ্লিক আর্ট, দ্বিতীয়টা হলো রিকশা পেইন্টিং।

রিকশা পেইন্টিং এর ক্ষেত্রে শিল্পীরা পাতলা টিন ব্যবহার করেন। শিল্পীরা প্রথমে টিনের পাতলাশিটের উপর সাদা এনামেল রঙের প্রলেপ দিয়ে নেন। রং শুকানোর পর তার উপর পেনসিল দিয়ে বিষয়বস্তুটি হালকাভাবে এঁকে নেন। তারপর বিষয়বস্তুতে রঙের প্রলেপ দেওয়া শুরু করেন। রিকশা পেইন্টিং এর জন্য শিল্পীরা এনামেল রং ব্যবহার করেন। উজ্জ্বল নীল, গোলাপি, সবুজ, বাদামি, হলুদ প্রভৃতি রঙের ব্যবহার করেন শিল্পীরা। যেহেতু এনামেল রং শুকানোর সাথে সাথে আঠালো হয়ে উঠে, তাই শিল্পীরা দ্রুত ছবির বিষয়বস্তুতে রঙের প্রলেপ দেওয়ার কাজ সম্পন্ন করেন। ছবি আঁকার সময় রঙের ঘনত্ব বেড়ে গেলে তাতে তারপিন তেল মিশিয়ে পাতলা করে নেন শিল্পীরা। রিকশা পেইন্টিং এর জন্য শিল্পীরা কাঠবিড়ালীর লোম দিয়ে তৈরি (squirrel hair brush) তুলিসহ বিভিন্ন রকমের তুলি বাজার থেকে সংগ্রহ করে ব্যবহার করেন।

বিষয়বস্তুটিতে রং দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হলে তাতে কালো অথবা গাঢ় রং দিয়ে সূক্ষ্ম রেখা ব্যবহার করেন। এর পর বিষয়বস্তুতে সাদা অথবা হালকা রং দিয়ে সুক্ষ রেখার সাহায্যে আলোর ব্যবহারকে তুলে ধরেন। গতিশীল রেখার এই ব্যবহারই হলো রিকশা পেইন্টিং এর মূল বৈশিষ্ট্য। এরপর শিল্পীরা স্বাক্ষর দিয়ে তাদের শিল্পকর্ম সম্পন্ন করেন।

এই শিল্পটাকে আরো জনপ্রিয় করার জন্য বর্তমানে গৃহসজ্জা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন ব্যবহারের অনেক সামগ্রীকে রিকশা পেইন্টিং দিয়ে অলংকৃত করা হচ্ছে। এই শিল্প আমাদের নিজস্ব তাই একে প্রচার আর প্রসারের মধ্য দিয়ে টিকিয়ে রাখতে হবে। কারণ যে দেশের শিল্প ও সংস্কৃতি যত বেশি সমৃদ্ধ সে জাতি তত বেশি উন্নত।

শিল্পী মামা বলেন রিকশা পেইন্টিং এর অঙ্কনশৈলি আয়ত্তে আনার জন্য তোমরা কিছু অনুশীলন করতে পার।

এই পাঠে যেভাবে আমরা রিকশা পেইন্টিং এর অঙ্কনশৈলি অনুশীলন করব

শিল্পী মামা বলেন দীর্ঘ দিনের চর্চার ফলে রিকশা পেইন্টিং এর অঙ্কনশৈলি আয়ত্তে আসে। এর রঙের ব্যবহারও ভিন্ন। ফলে

- প্রাথমিকভাবে বইয়ে দেওয়া ছবি দেখে রিকশা পেইন্টিং এর ফুল, লতা পাতা ইত্যাদি পোস্টার রং অথবা সহজলভ্য যেকোন রং দিয়ে অনুশীলন করতে পার। তাতে করে রিকশা পেইন্টিং এর অঙ্কনশৈলি আয়ত্তের কাজ শুরু হবে।
- বইয়ে দেওয়া ছবি দেখে রিকশা পেইন্টিং এর ক্যালিগ্রাফি অনুশীলন করতে পার।
- বইয়ে দেওয়া ছবি দেখে রিকশা পেইন্টিং এর আদলে স্মৃতিসৌধ, শহীদ মিনারসহ মুক্তিযুদ্ধের নানা দৃশ্য অনুশীলন করতে পার।
- অঙ্কনশৈলি আয়ত্তে এসে গেলে পরবর্তীকালে তোমরা এনামেল রং ব্যবহার করেও ছবি আঁকতে পার।

রিকশা পেইন্টিং সম্পর্কে জানতে জানতে সকলের খিদে পেয়ে গেছে। আগুন শিল্পী মামার দিকে করুণ চোখে

তাকিয়ে বলল, মামা বিরিয়ানি খাব। মামা হেসে বললেন, চল তোমাদের ঢাকার বিখ্যাত কাচ্চি বিরিয়ানি খাওয়াব। খুশিতে সকলের চোখ চকচক করে উঠল। পুরান ঢাকার একটি রেস্তোরাঁতে ঢুকে কাচ্চি বিরিয়ানি খেতে খেতে মামা জানালেন, ঢাকার মোগলাই খাবারের কথা। বিভিন্ন ধরনের কাবাব, বিরিয়ানি, বোরহানি, লাচ্ছি আরও কত রকমের খাবার! তবে বিশেষ একধরনের খাবার আছে যার নাম বাকরখানি—ময়দা দিয়ে এক ধরনের ভাজা রুটি।

খাবারের পালা শেষ, এবার তাদের ঢাকার ঐতিহাসিক জায়গা সমূহ ভ্রমনের পালা। তালিকার প্রথমেই আছে পুরান ঢাকার ঐতিহাসিক আহসান মঞ্জিল।

আহসান মঞ্জিল

এটি ছিল মূলত ঢাকার নবাবদের প্রাসাদ। ১৮৭২ সালে নবাব আব্দুল গনি তাঁর পুত্র আহসানউল্লাহ এর নামে নামকরণ করেন। পুরান ঢাকার ইসলামপুরে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে আহসান মঞ্জিল অবস্থিত। এটি ঢাকার শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম। সুরম্য এই ভবনের ছাদে রয়েছে একটি বড় গম্বুজ। প্রবেশ মুখে প্রশস্ত সিঁড়ি উঠে গেছে দ্বিতীয় তলা পর্যন্ত যা প্রাসাদের আকর্ষণকে বহুগুন বৃদ্ধি করেছে। বারান্দা ও কক্ষগুলোর

মেঝেতে মার্বেল পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাসাদের বাইরের দেয়ালের গায়ের নকশাগুলো অত্যন্ত আকর্ষণীয়। প্রাসাদটি বর্তমানে জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এরপর লালবাগ কেল্লা, ছোট কাটরা, বড় কাটরা, আর্মেনিটোলার আর্মেনিয়ান চার্চ, ঢাকেশ্বরী মন্দির, তারা মসজিদ দেখে পঞ্চরত্ন আসল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়।

এখানে এসে যে স্থাপনাটি প্রথমে তাদের মন-প্রাণকে আলোড়িত করেছে তাহলো শহিদ মিনার। তারা পায়ের জুতা খুলে শহিদ মিনারের বেদিতে উঠল। চোখ বুজে পঞ্চরত্ন অনুভব করার চেষ্টা করতে লাগল ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির সে দিনটির কথা। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় কি নির্ভয়ে সেদিন ঘাতকের বন্দুকের সামনে বুক পেতে দিয়েছিল বাংলা মায়ের দামাল সন্তানেরা। এরপর শিল্পী মামা তাদের শহিদ মিনার সম্পর্কে বলতে লাগলেন।

শহিদ মিনার

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানাতে নির্মাণ করা হয়েছিল শহিদ মিনার। শিল্পী হামিদুর রহমানের রূপকল্পনায় হলো মধ্যস্থলের সুউচ্চ কাঠামোটি আনত মস্তকে স্নেহময়ী মাতার প্রতীক। দুই পাশে তুলনামূলক ছোট দুটি করে কাঠামো হলো সন্তানের প্রতীক স্বরূপ।

মূল পরিকল্পনায় আরও ছিল সামনে বাঁধানো চত্বর। পেছনে থাকবে দেয়ালচিত্র। ভাস্কর নভেরা আহমেদের দুটি ম্যুরাল থাকবে সম্মুখ চত্বরে।

উক্ত পরিকল্পনা ও নকশা অনুযায়ী কাজ শুরু হয়। এই সময় শিল্পী হামিদুর রহমানের সহকর্মী হিসেবে ভাস্কর নভেরা আহমদ এই কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। কিছুদূর কাজ এগুনোর পর ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি হওয়ায় শহিদ মিনার তৈরির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৬২ সালে শহিদ মিনারের মূল নকশা বহুলাংশে পরিবর্তন করে একটি নকশা দাঁড় করানো হয়। এ নকশা অনুযায়ী ১৯৬৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদ মিনার উদ্বোধন করা হয়। এই শহিদ মিনারই একুশের চেতনার প্রতীক হয়ে উঠেছে সারা পৃথিবীর মানুষের মনে। ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি দিলে শহিদ মিনার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার প্রতীক হয়ে ওঠে বিশ্ববাসীর কাছে।

এ সময়ে হঠাৎ করেই সমীরের মায়ের কাছে শেখা একটি ভাষার গানের চরণ মনে আসে। গানটির রচয়িতা হলেন চারণকবি শামসুদ্দিন আহমেদ তেলি। শহিদ মিনারে দাঁড়িয়ে সমীর গানটি গাইতে লাগল।

রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন করিলি রে বাঙালি

তোরা ঢাকার শহর রক্তে ভাসাইলি।

তোরা ঢাকার শহর রক্তে ভাসাইলি

ও বাঙালি ও ও ও

তোতা পাখি পড়তে আইসা খোয়াইলি পরাণ

মায় সে জানে পুতের বেদন যার কলিজার যান রে বাঙালি ।

ও বাঙালি ও ও ও

ইংরাজ যুগে হাটুর নিচে চালাইতো গুলি

স্বাধীন দেশে ভাইয়ে ভাইয়ে উড়ায় মাথার খুলি রে বাঙালি ।

ও বাঙালি ও ও ও

গুলি খাওয়া ছাত্রের রুহ কেন্দে কেন্দে কয়

তোমরা বাঙালি মা ডাকিও আমার অভাগিনী মায় রে বাঙালি ।

ও বাঙালি ও ও ও

বাপ কান্দে মায় কান্দে কান্দে জোড়ের ভাই

পাড়া পড়শি কেন্দে বলে আমার খেলার সাথী নাই রে বাঙালি ।

গানটি গাওয়া শেষ হলে পঞ্চরত্নের বাকি বন্ধুরা আবেগাপ্লুত হয়ে সমীরকে জড়িয়ে ধরল। অবনী বলল, ফিরে

গিয়ে স্কুলে আমরা এই গানটির জারিনাচের ভঙ্গির সাথে মিলিয়ে অনুশীলন করব। যাতে আমরা স্কুলের অনুষ্ঠানে তা পরিবেশন করতে পারি।

শহিদ মিনার থেকে পঞ্চরত্ন পায়ে হেঁটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় মসজিদ চত্বরে পৌঁছুল। এখানে রয়েছে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিসৌধ। সে চত্বরে আরও শায়িত আছেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, পটুয়া কামরুল হাসান ও শিল্পগুরু শফিউদ্দীন আহমদ। সবার স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাতে জানাতে তাদের কানে মসজিদের মিনার থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে এলো। তার সাথে সাথে আকাশ সবাইকে মনে করিয়ে দিল জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের রচিত সেই বিখ্যাত গজল-

মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই

যেন গোরে থেকেও মুয়াজ্জিনের আযান শুনতে পাই।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিসৌধ থেকে বাইরে বের হয়ে পঞ্চরত্ন খেয়াল করল অনেক তরুণ ছেলে মেয়ে ছবি আঁকার বোর্ড, ক্যানভাসসহ ছবি আকার বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে একটা মনোরম স্থাপনার দিকে যাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে পঞ্চরত্নের ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে। শিল্পী মামা বিষয়টা বুঝতে পেরে মুচকি হেসে বললেন এইসব তরুণ শিল্পী কোথায় যাচ্ছে সেটাইতো জানতে চাও, কি ঠিক না? সবাই সমস্বরে বলল ঠিক।

শিল্পী মামা বললেন সামনেই রয়েছে আমার প্রাণের জায়গা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ। তারা সেখানে প্রবেশ করে দেখতে পেল বিভিন্ন স্থানে বসে শিক্ষার্থীরা পেনসিল স্কেচ, জলরং, প্রভৃতির মাধ্যমে ছবি আঁকছে। ছবি আঁকার এই মাধ্যমগুলো তারা চিনতে পেরেছে তবে অনেক মাধ্যম তারা ঠিক চিনতে পারছে না। শিল্পী মামা তাদেরকে মাধ্যমগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং সাথে করে চিত্রকলা, ভাস্কর্য, ছাপচিত্রসহ সকল বিভাগে নিয়ে গেলেন। সেখানে তারা শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলে মাধ্যমগুলো সম্পর্কে জানল। এ যেন অন্য এক পৃথিবী। যে পৃথিবীতে শিল্পীরা মানুষের জন্য স্বপ্ন বুনে।

সেখান থেকে তারা গেল জাতীয় জাদুঘরে। এ যেন সমগ্র দেশটায় একটা ছাদের নীচে। জাদুঘরের প্রতিটি শিল্প সামগ্রীতে তারা নিজের দেশের সংস্কৃতিটাকে আবার খুঁজে বের করার চেষ্টা করল। যেমন করে তারা খুঁজে চলছে কল্পনার এই ভ্রমণের ভেতর দিয়ে।

এরপর মামা তাদের নিয়ে গেলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের অনিন্দ্য সুন্দর 'অপরাজেয় বাংলা' দেখাতে। অপরাজেয় বাংলার সামনে এসে মামা নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ভাস্কর্যটির দিকে।

অপরাজেয় বাংলা

ইরা মামাকে বলে উঠল, কি ভাবছ মামা? মামা বললেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর অপরাজেয় বাংলা এই দুটি যেন সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নাম। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি স্তরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা চিরস্মরণীয়। এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এই অপরাজেয় বাংলা ভাস্কর্যটি। তিনজন দণ্ডায়মান মুক্তিযোদ্ধা যেন সারা দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতীক। এই ভাস্কর্যটি নির্মাণ করেছেন মুক্তিযোদ্ধা ভাস্কর সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ এবং এর নামকরণ করেছেন মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক সালেহ চৌধুরী। ভাস্কর্যটির দণ্ডায়মান তিনজন মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে দুজন পুরুষ ও একজন নারী।

দণ্ডায়মান তিনজন মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে একজন ডান হাতে দিয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ে রাইফেলের বেল্ট ধরে আছেন। যিনি এই ভাস্কর্যে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছেন। তাঁর চোখমুখ স্বাধীনতার দৃঢ় চেতনায় উদ্দীপ্ত। এর মডেল ছিলেন আর্ট কলেজের ছাত্র মুক্তিযোদ্ধা বদরুল আলম বেনু। থ্রি নট থ্রি রাইফেল হাতে সাবলীল ভঙ্গিতে দাঁড়ানো অপর মডেল ছিলেন সৈয়দ হামিদ মকসুদ ফজল। আর নারী মুক্তিযোদ্ধার মডেল ছিলেন হাসিনা আহমেদ। ১৯৭৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৯টায় এ ভাস্কর্যটি উদ্বোধন করা হয়। সেসময় থেকে এই অপরাজেয় বাংলা এই দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রামের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আকাশ শিল্পী মামাকে বলল, যে শিল্পী এই কালজয়ী ভাস্কর্যটি সৃষ্টি করেছেন আমরা তাঁর সম্পর্কে জানতে চাই। শিল্পী মামা বললেন তাহলে শোন-

বাংলাদেশের স্বনামখ্যাত ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী অধ্যাপক সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ সিলেট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৯ সালে তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফ্টস (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ) থেকে চিত্রাঙ্কন বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেন। পরে তিনি ১৯৭৪ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

জারুল, সোনালু আর কৃষ্ণচূড়ার রঙে রাঙানো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্যামল প্রকৃতি তাঁকে নিবিড় মমতায় জড়িয়ে রেখেছিল সবসময়। ফলে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাস্কর্য বিভাগে শিক্ষকতা দিয়ে। তিনি ১৯৭২ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকাকালে ‘অপরাজেয় বাংলা’ ভাস্কর্যটি তৈরির দায়িত্ব পান। সেসময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসুর উদ্যোগে কলাভবনের সামনে এই অমর ভাস্কর্যটির নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৭৩ সালে তিনি ভাস্কর্যটির নির্মাণ কাজ শুরু করেন এবং ১৯৭৯ সালে নির্মাণ কাজ শেষ হয়। সেসময় থেকে এই অপরাজেয় বাংলা এই দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রামের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভাস্কর সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদের অমর সৃষ্টিগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ টেলিভিশন কেন্দ্রের সামনের দেয়ালে করা ম্যুরাল ‘আবহমান বাংলা’, বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনের টেরাকোটার শিল্পকর্ম, চাঁদপুর জেলার ‘অঙ্গীকার স্মৃতিসৌধ’, মা ও শিশু, অঙ্কুর, ডলফিন ইত্যাদি।

শিল্পকলা ও ভাস্কর্যে গৌরবজনক অবদানের জন্য তিনি ২০১৪ সালে ‘শিল্পকলা পদক’ এবং ২০১৭ সালে ‘একুশে পদক’ লাভ করেন। ২০১৭ সালে এই শিল্পী মৃত্যুবরন করেন।

ধীরে ধীরে কখন যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, কারো সেদিকে খেয়াল নেই। শিল্পী মামা বললেন ঢাকার সবকিছু দেখতে হলে আরও অনেক সময়ের প্রয়োজন। চল আমরা এবার বাড়ি ফিরে যাই। এই বলে, তারা শিল্পী মামার বাড়ির উদ্দেশ রওনা হলো। এরপর তাদের ভ্রমণের গন্তব্য হলো ব্রহ্মপুত্র বিধৌত অঞ্চল ময়মনসিংহ বিভাগ।

এই অধ্যায়ে আমরা যা করব –

- রিকশা পেইন্টিং এর অঙ্কনশৈলিতে দক্ষতা অর্জনের জন্য পোস্টার রং অথবা যেকোনো সহজলভ্য মাধ্যমে ক্যালিগ্রাফি অনুশীলন করব।
- রিকশা পেইন্টিং এর অঙ্কনশৈলি অনুসরণ করে পোস্টার রং অথবা যেকোনো সহজলভ্য মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ ও বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের ছবি আঁকব।
- আমরা জারিনাচের ভঙ্গিগুলো অনুশীলন করব। ভাষা আন্দোলনের গান ‘তোরা ঢাকা শহর রক্তে ভাসাইলি’ এর সাথে জারিনাচের ভঙ্গিগুলো মিলিয়ে সহজ সরল একটি পরিবেশনা তৈরি করব।
- নিজেদের আশেপাশে কোনো রিকশা পেইন্টার আছে কিনা অনুসন্ধান করব। যদি থাকে তবে তাঁর কাছে রিকশা পেইন্টিং এর অঙ্কনশৈলী এবং মাধ্যমের ব্যবহার শিখে নেওয়ার চেষ্টা করব।
- নিজেদের এলাকায় শহিদ মিনার অথবা মুক্তিযুদ্ধের কোন ভাস্কর্য/ স্থাপনা আছে কিনা তা অনুসন্ধান করব। যদি থাকে তা ভালভাবে দেখব এবং বন্ধুখাতায় তার বর্ণনা লিখব।
- ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী অধ্যাপক সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ এর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব।

কল্পযানে চড়ে ব্রহ্মপুত্র পাড়ে

“হাওর জঙ্গাল মৈষের শিং
এই তিনে মৈমনসিং”

কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস ট্রেনে পঞ্চরত্ন ঢাকা থেকে যাত্রা করল ময়মনসিংহের উদ্দেশে। ট্রেন ছাড়ার কয়েক মিনিট পর ট্রেনের ছন্দময় দুলুনিতে সমীর রেলগাড়ি নিয়ে ময়মনসিংহের প্রচলিত একটি লোকছন্দ মাথা নেড়েনেড়ে আওড়াতে লাগলো।

“ঝক্কর ঝক্কর ময়মনসিং
ঢাকা যাইতে কতদিন”

বলতে বলতে মুহূর্তেই ট্রেন ময়মনসিংহ পৌঁছে গেল। আকাশের খালার বাড়ি ময়মনসিংহ শহরে। খালামনি সবাইকে দেখে খুব খুশি হলেন। তিনি থাকার সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। রাতে খাবারের পর ঘরোয়া আড্ডায় এ অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি নিয়ে অনেক আলোচনা হলো।

ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর ও নেত্রকোণা এই চারটি জেলা নিয়ে ময়মনসিংহ বিভাগ গঠিত। ব্রহ্মপুত্র বিধৌত এ অঞ্চলের রয়েছে প্রাচীন ঐতিহ্য। ময়মনসিংহ গীতিকা, জারি-সারি, পালা, কিসসা-কাহিনি, উঠান বৈঠক, লোক সাহিত্যকর্ম, গীতবাদ্য, বাঁশ-বেতের কাজ ইত্যাদি এই বিভাগের লোক সংস্কৃতির অন্যতম দিক। এই জনপদের নারীরা নকশি পিঠা, পাকন পিঠা, বিভিন্ন প্রকার হস্ত ও কারুশিল্প তৈরিতে ব্যস্ত থাকে।

নকশিকাঁথা এই অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারুশিল্প। কথার ফাঁকে আকাশের খালা একটি নকশিকাঁথা সবাইকে দেখালেন। আকাশের খালার বিয়ের সময় বাবার বাড়ি থেকে দুটি নকশিকাঁথা দিয়েছিল। এটি এ অঞ্চলের রেওয়াজ। এই কাঁথা আকাশের নানী নিজেই বুনেছিলেন, সাথে প্রতিবেশী মহিলারা সাহায্য করেছিলো। খালা বলল তোমাদের কাল জামালপুরের একটি নকশিকাঁথার গ্রামে নিয়ে যাব। যেখানে তোমরা নকশিকাঁথা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবে।

নকশিকাঁথা

পরের দিন ট্রেনে এক ঘণ্টার পথ অতিক্রম করে তারা জামালপুর পৌঁছাল। এখানে অনেক নারী শিল্পী কাঁথা সেলাই করছে। লাল জমিন, কালো জমিন, সাদা বা আরো কতো রকম জমিনে বাহারি সুতার কারুকাজ। অবনী বলল শুনেছিলাম পুরাতন শাড়ির পাড় থেকে সুতা তোলা হয়, কিন্তু দেখছিনা তো।

একজন কাঁথা শিল্পী উত্তর দেয়, ওসব সৌখিন গ্রামীণ নকশিকাঁথা সচরাচর খুঁজে পাবে না । সেসব সৌখিন কাঁথা সখের বশে অনেকদিন সময় নিয়ে সাধারণত নিজেদের জন্য তৈরি করতো। এখন তারা নতুন কাপড়ে, নতুন সুতায়, আধুনিক ডিজাইনে নকশিকাঁথা তৈরি করছে। সময়ও কম লাগছে। নকশিপল্লী থেকে তারা এর ইতিহাস, নির্মাণ কৌশল, নানা প্রকার নকশিকাঁথার কথা জানলো।

নকশিকাঁথার ধারা মূলত দু’ রকমের যেমন- যশোর রীতি ও রাজশাহী রীতি। এছাড়াও ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, খুলনা ও চট্টগ্রাম ধারাও লক্ষণীয়।

নকশিকাঁথা সেলাই এ সুই এর একেকটি ফোঁড় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুই একবার গেঁথে উপরে উঠানোকে এক একটি ফোঁড় বলে। নানা ধরনের নকশায় বিভিন্ন প্রকার ফোঁড় ব্যবহার করা হয়। যেমন—রানিং ফোঁড়, ক্রস ফোঁড়, হেরিংবোন, তারা ফোঁড়, গুজরাটি, হেম ফোঁড়, যশোর সেলাই, চাটাই সেলাই, কাইত্যা সেলাই, রিফু সেলাই, শর সেলাই, সার্টিন সেলাই, ব্যাক সেলাই ইত্যাদি।

নকশিকাঁথায় রানিং সেলাই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়। রানিং সেলাই দিয়ে কাঁথার মূল জমিনের পরতগুলো প্রথমে আটকিয়ে নেওয়া হয়। ফোঁড় দেওয়া এক একটি লাইনকে তাগা বলে। অনেকগুলো তাগা দিয়েই জমিন তৈরি করা হয়। এরপর নানান প্রকার ফোঁড় দিয়ে নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। রানিং ফোঁড়ের নকশাই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। নকশিকাঁথার পাড়েও নানা প্রকার নকশা করা হয়, যা জমিনের নকশা থেকে আলাদা। যেমন- মালা পাড়, মই পাড়, গাট পাড়, চিকপাড়, নাকের দুল, মাছ পাড়, পাঁচ পাড়, শামুক পাড়, ঢেউ পাড়, বরফি পাড় ইত্যাদি।

শুধু গায়ে জড়িয়ে শীত নিবারণের জন্যই এই কাঁথা তৈরি করা হয় না। বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কাঁথার প্রচলন আছে। যেমন- সুজনি কাঁথা, লেপকাঁথা, রুমাল কাঁথা, ছাপা বা খোল, জায়নামাজ, আসন, দস্তরখানা, আরশিলতা, বটুয়া, বুগইল - পান সুপারি রাখার ছোট থলে বা খিচা, গাটারি - বই/কোরআনশরীফ ইত্যাদি পেঁচিয়ে রাখার ঝোলা বা মোড়ক, বস্তানি - তৈজসপত্র রাখার বড় গাটরি, থলিয়া - তসবি, জপের মালা ইত্যাদি রাখার জন্য। এইসব নকশিকাঁথায় আশেপাশে দেখা নানা বস্তু যেমন- গাছ- লতা পাতা, ফুল- ফল, চন্দ্র-সূর্য, পশু-পাখি, সরতা, হাতপাখা, কাপ-প্লেট ইত্যাদির ব্যবহার দেখা যায়। এছাড়াও জ্যামিতিক নকশা, বৃত্ত, ত্রিভূজ, চতুর্ভুজ, কলকা ইত্যাদির ব্যবহারও লক্ষ্যনীয়।

পঞ্চরত্ন জামালপুর নকশিপল্লীতে এসে লক্ষ করল এখানকার নকশিকাঁথা আকাশের খালার বাড়িতে দেখা প্রাচীন নকশিকাঁথা থেকে একটু আলাদা। কাপড়, ডিজাইন, সেলাই, প্যাটার্ন, রং সবকিছুতেই আধুনিকতার ছাপ। নকশিকাঁথায়ও এসেছে নানা বৈচিত্র্য। এই কাঁথা সেলাই করতেও আগের মতো আর অতোটা সময় লাগে না। ব্যবসায়িক উৎকর্ষে এখানকার নকশিকাঁথা দেশের গন্ডি পেরিয়ে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমাদৃত। পঞ্চরত্ন নকশিকাঁথা শিল্পীদের থেকে কয়েক ধরনের সেলাই বা ফোঁড় শিখে নিয়ে তা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য বন্ধুখাতায় লিখে রাখল।

এই পাঠে আমরা কয়েকটি ফোঁড়ের নাম ও সেলাই পদ্ধতি সম্পর্কে জানব

১। রানিংফোঁড় ২। ক্রস ফোঁড় ৩। সাটিন ফোঁড় ৪। হেরিং বোন ৫। তারা ফোঁড় ৬। হেম ফোঁড় ৭। স্টেম ফোঁড় ৮। বখেয়া ফোঁড় ৯। লেজি ডেইজি, ইত্যাদি।

এসব ফোঁড় দিয়ে সেলাই করতে ছোটবড় নানা ধরনের সুই, চিকন মোটা অনেক রকম রঙিন সুতা, ফ্রেম ইত্যাদি প্রয়োজন হয়।

(উপকরণ এর ছবি)

বিভিন্নরকমের সুঁইসুতা ও উপকরণ

রানিং ফোঁড়

রানিং ফোঁড় সবচেয়ে সহজ ও বহুল প্রচলিত সেলাই পদ্ধতি। সুই পরপর তিন থেকে চারবার কাপড়ে গেঁথে বা ডুবিয়ে উপরে তোলা হয়। এরপর সুতাকে টেনে নিয়ে আবার একই ভাবে বারবার সেলাই করে রানিং ফোঁড় করা হয়।

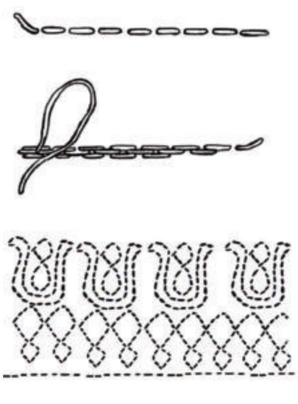

ক্রস ফোঁড়

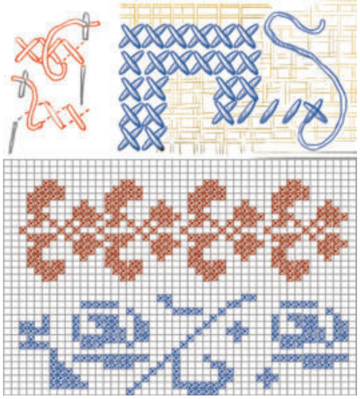

এই ফোঁড়ে করা চটের উপর নকশা তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। অনেকটা গুণ বা ক্রস চিহ্ন এর মতই এই সেলাই। ক্রস ফোঁড়ের জন্য সাধারণত মোটা বুননের কাপড়, চট, সেলুলা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। গ্রাফ করা ছকের মতো করে ক্রস ফোঁড়ের নকশা দেখতে জ্যামিতিক ডিজাইনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জামদানি নকশাও অনেকটা ক্রস ফোঁড়ের মত। তোমরা চিত্র দেখেই এই সেলাই আয়ত্ত করতে পারবে।

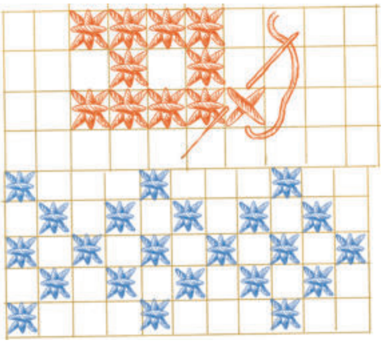

তারা ফোঁড়

তারা ফোঁড়ও অনেকটা ক্রস ফোঁড়ের মতো। সাধারণত চট, নেট বা সেলুলা কাপড়ে ক্রস ফোঁড় ব্যবহার করা হয়। একটি ক্রস কোনাকুনি গুন চিহ্নের মতো ও তার উপর আরেকটি ক্রস যোগ চিহ্নের মতো দিলে ক্রস ফোঁড় হয়ে যাবে।

বখেয়া ফোঁড়

বখেয়া ফোঁড় তুলতে রানিং ফোঁড়ের মতো নিচ থেকে উপরে সুই চালিয়ে ফোঁড় তুলতে হয়। এই ফোঁড় দেখতে মেশিনের সেলাইর মতো । প্রথম ফোঁড় থেকে সামান্য পিছনে সুই গেঁথে আবার প্রথম ফোঁড়ের সামান্য সামনে সুই উঠিয়ে এর মুখটি আবার আগের ফোঁড়ের কাছে ফিরিয়ে আনতে হবে। এভাবে বারবার চলতে থাকলে বখেয়া ফোঁড় সেলাই হয়ে যাবে। জামা কাপড় শক্তভাবে জোড়া লাগাতে এই ফোঁড় ব্যবহার করা হয়। নকশি কাঁথার নকশাসহ যেকোনো নকশা বখেয়া ফোঁড় দিয়ে করা যায়।

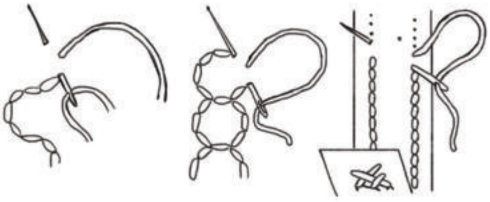

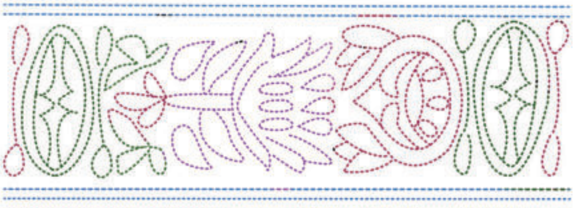

আমরা নানা প্রকার ফোঁড় সম্পর্কে জানলাম। যা আমরা ফিরে গিয়ে অনুশীলন করব। তারা এবার এসেছে নকশিকাঁথার বাজারে। জামালপুর শহরের প্রতিটি মহল্লায়, রাস্তার পাশে, মার্কেটে সর্বত্র কারুশিল্পের দোকান রয়েছে। এখানে নকশিকাঁথার সেলাই এ শাড়ি, পাঞ্জাবি, ফতুয়া, টু-পিস, থ্রি-পিস, পায়জামা, ব্যাগ নানা প্রকার শো-পিসসহ হাজারো রকমের পণ্য পাওয়া যায়।

নকশিকাঁথার সেলাইয়ের ফোঁড় এবং মোটিফগুলো দেখে অবনীর মাথায় নতুন ভাবনা এলো, সে বলল ফিরে গিয়ে আমরাও নকশিকাঁথার এই সব ফোঁড় ব্যবহার করে নতুন নকশা তৈরি করতে পারি। আগুন বলল তোমরা না হয় খুব সহজে সেলাইয়ের ফোঁড় দিয়ে নকশা তৈরি করতে পারবে। কিন্তু আমিতো সেলাই ভাল জানিনা, তাহলে আমি কিভাবে নকশা করব? অবনী বলল আমরা যারা সেলাই করতে পারব তারা ছোট একটা নকশা ইচ্ছে মত সুঁই সুতার ফোঁড় দিয়ে কাপড়ে করব। আর যারা সুঁই সুতার ফোঁড় দিয়ে কাপড়ে করতে পারবেনা তারা বিভিন্ন রঙের কলম দিয়ে আথবা পোস্টার রং দিয়ে কাগজে করবে।

এই পাঠে আমারা জানব কিভাবে সেলাইয়ের ফোঁড়ের মতো নকশা তৈরি করা যায়

- প্রথমে প্রাকৃতিক আকৃতি—ফুল, লতা, পাতা অথবা জ্যামিতিক আকৃতি—ত্রিভূজ, বৃত্ত ইত্যাদি থেকে নিজের পছন্দমতো আকৃতি নিয়ে একটা মোটিফ তৈরি করব।
- মোটিফটির মাপ হবে দৈর্ঘ্য দেড় ইঞ্চি এবং প্রস্থ দেড় ইঞ্চি
- এবার কাগজে দৈর্ঘ্যে ৬ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ৬ ইঞ্চি একটা বর্গক্ষেত্র এঁকে নিব।
- বর্গক্ষেত্রটিকে সমান চারটি ভাগে ভাগ করে নিব।
- মোটিফটি বর্গক্ষেত্রের চারটি ভাগে সমান ভাবে এঁকে নিব।
- এবার মোটিফগুলো সেলাইয়ের রানিং ফোঁড়ের মতো করে বিভিন্ন রঙের কলম অথবা পোস্টার রং তুলি দিয়ে ভরাট করব। এভাবে সম্পূর্ণ নকশাটি রং করা শেষ করব।
- একই ভাবে নকশা সেলাইয়ের ফোঁড় দিয়ে আমরা কাপড়ের উপরেও ফুটিয়ে তুলব।

অবনীর এই পরিকল্পনা শুনে আগুন বলল বাহ! বেশ সুন্দর আইডিয়াতো। এভাবে আমরা খুব সহজে নতুন নতুন পন্যের নকশা করতে পারি। যেমন- উপহার কার্ড, উপহার সামগ্রীর বাক্স, ফটোফ্রেম, কলমদানী ইত্যাদি। এইভাবে নকশিকাঁথার শৈলিকে আমরা নানা মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে পারি। সাথে সাথে আমাদের ঐতিহ্য নকশিকাঁথাকে আরো বেশি করে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। তাহলে বিশ্বের মানুষ জানবে আমাদের ঐতিহ্যবাহী এক একটি নকশিকাঁথা যেন এক একটি গল্পের মাঠ। সুঁই সুতার নিপুন শৈলিতে বাংলার মেয়েরা বা বধূরা সে সুখ দুঃখের গল্প রচনা করছে। আমাদের পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন তাঁর অমর সৃষ্টি “নকশী কাঁথার মাঠ”-এ সে সুখ দুঃখের গল্পকে দিয়েছে এক কাব্যিক রূপ।

এবার আমরা এক নৃত্যশিল্পীর কথা জানব যিনি তাঁর সৃষ্টিশীলতা দিয়ে পল্লী কবি জসীমউদ্‌দীনের অন্যতম রচনা “নকশী কাঁথার মাঠ” কে দিয়েছে এক অনবদ্য নৃত্যরূপ।

গাজী আলিমদ্দিন মান্নান জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৩১ সনের ৮ ই জুন কুমিল্লার সাতকলা গ্রামে। বাংলাদেশের নৃত্য জগতে তাঁর অবদান অসামান্য। নৃত্যের প্রতি প্রবল আগ্রহের ফলে তিনি নৃত্য শেখার জন্য শান্তিবর্ধনের আহ্বানে দেশ ছেড়ে বোম্বে পাড়ি জমান। সেখানে তিনি লিটল ব্যালে ছাত্র হিসেবে যোগদান করেন। শিক্ষা সম্পন্ন করে তিনি সেখানে কিছুদিন শিক্ষকতাও করেন। এরপর তিনি ১৯৫৫ সালে চীনে পাড়ি জমান এবং সেখানে তিনি অ্যাক্রবেটিক ডান্স, আলোকসম্পাত ও মঞ্চসজ্জা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি দেশে ফিরে ১৯৫৮ সালে বুলবুল ললিতকলা একাডেমীতে যোগদান করেন। ১৯৬৩ সালে 'নিক্কন ললিতকলা একাডেমী' নামে নিজের নৃত্যপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এছাড়া ১৯৭৯ সালে জাতীয় পারফর্মিং আর্টস এবং ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নৃত্যপরিচালক হিসেবে দক্ষতার সাথে কাজ করেন।

১৯৬১ সালে প্রথম পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীনের অন্যতম রচনা "নকশীকাঁথার মাঠ" কে এক অনবদ্য নৃত্যরূপ দিয়েছিলেন গাজী আলিমদ্দিন মান্নান।

সেদিন ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটের হলের আলো জ্বলে উঠল। সমস্ত হল জুড়ে নিস্তব্ধতা। সুরের মূর্ছনার রেশ এখনও কাটেনি। দর্শকসারির সামনে বসে আছেন পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন। তাঁর কল্পতরু যেন বটবৃক্ষের রূপ ধারণ করেছে। মঞ্চের কালো পর্দা সরে গেল। রূপাই-সাজু সহ একে একে সকল কলাকুশলী মঞ্চে এসে উপস্থিত হল। সাথে সাথে সজোড় হাততালিতে হলঘরের নিস্তব্ধতা নিমেষেই ভেঙে গেল। অভিভূত কবি মঞ্চে উঠে রূপাইকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। সেদিন নকশীকাঁথা মাঠের রূপাইয়ের

ভূমিকায় ছিলেন গাজী আলিমদ্দিন মান্নান ওরফে জি এ মান্নান। তারই পরিচালনায় ও নির্দেশনায় নকশীকাঁথা মাঠের নৃত্যের মাধ্যমে কাহিনি বিন্যাসের অপূর্ব রূপ ফুটে উঠেছে যা এর আগে কেউ দেখেনি। নকশীকাঁথার মাঠ একধরনের ব্যালাড অর্থাৎ লোকগাঁথার বিশুদ্ধ সুর ও ছন্দসমন্বিত রূপ। আর বাংলার লোককাব্য নকশীকাঁথার মাঠকে পাশ্চাত্যের ব্যালে (পশ্চিমী নৃত্যনাট্য) নৃত্যের আঙ্গিকে, বাংলার লোকসংস্কৃতির উপাদান মিশিয়ে মঞ্চস্থ করেছিলেন জি এ মান্নান। নকশীকাঁথার মাঠ নৃত্যনাট্যের সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন ওস্তাদ খাদেম খান। আর শিল্পনির্দেশনা দিয়েছেন পটুয়া কামরুল হাসান।

তাঁর সৃষ্ট অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নৃত্যসমূহ—নকশীকাঁথার মাঠ, ক্ষুধিত পাষাণ, মহুয়া, কাশ্মিরী, অধিক খাদ্য ফলাও, হাজার তারের বীণা, আলীবাবা চল্লিশ চোর, নবান্ন ইত্যাদি। ১৯৯২ সালের ১ মার্চ জি এ মান্নানের জীবনাবসান ঘটে।

সেদিন রাতের খাবারের পর সবাই মিলে গল্প করতে বসেছে। আগুন খালার কাছে ময়মনসিংহের জনপ্রিয় খাবারগুলো সম্পর্কে জানতে চাইলে খালা বললেন- ময়মনসিংহ অঞ্চলের খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে মুক্তাগাছার মন্ডা, শেরপুরের ছানার পায়েশ, নেত্রকোনার বালিশ মিষ্টি ও জামালপুরের ছানার পোলাও প্রসিদ্ধ ।

গল্পের মাঝে খালু এসে তাদের সাথে যোগদিল। ময়মনসিংহের লোক-সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনার এক ফাঁকে খালু বললেন- বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ চিরদিনই সহজ সরল জীবন যাপনেই অভ্যস্ত। ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চল বিশেষ করে নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জের একটি জনপ্রিয় লোক সংস্কৃতি হল পালাগান।

পালাগান

পালাগান হলো লৌকিক আখ্যানমূলক গীত কীর্তন। পৌরাণিক কাহিনি, ধর্ম সংগীত, দেবদেবীর গুণ কীর্তন পালাগানের মূল বিষয় ছিল। যেমন—নিমাই সন্ন্যাস, নৌকা বিলাস। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে পালা গানের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন এসেছে। সামাজিক ঘটনা, মূল্যবোধ, সমাজ সচেতনতামূলক বার্তা, ব্যক্তিগত

ও লৌকিক ঘটনা ইত্যাদি নিয়েও পালাগান রচিত হয় ।

যেমন মহুয়া, মলুয়া, দেওয়ানা মদিনা। দিনের বেলায় পরিবেশন করা পালাগানকে দিবাপালা ও রাতে পরিবেশিত পালাকে নিশিপালা বলে।

পালাগানে দীর্ঘ গানের পাশাপাশি কিছু শ্লোক ও কথা থাকে। যিনি পালা রচনা করেন তাকে পদকর্তা বা অধিকারী বলা হয়। একজন গায়ক বা গায়েন পালা গান পরিবেশনার মূল ভূমিকায় থাকেন। তাকে বয়াতিও বলা হয়। বয়াতিকে সহযোগিতা করার জন্য চার পাঁচজন দোহার থাকেন। তারা ঢাক-ঢোল, করতাল, হারমোনিয়ামসহ কথোপকথনে অংশ নিয়ে সহযোগিতা করে।

পালাগানের গল্পে নায়ক, নায়িকা, পার্শ্ব-চরিত্র, পশুপাখি, সবই থাকে। বয়াতি সকল চরিত্রকে একাই সূর ও অংগভঙ্গীর মাধ্যমে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলে। বয়াতির চুল থাকে লম্বা, হাতে একখণ্ড রুমাল, কোমরে গামছা বা ওড়না বাঁধা থাকে। পরনে থাকে বর্নিল ঘাগড়া। কখনও ওড়না মাথায় দিয়ে মেয়ে চরিত্রও বয়াতি একাই প্রদর্শন করে। বয়াতি বন্দনা গীতি দিয়ে পালা শুরু করে। যেমন—

পুবেতে বন্দনা করলাম পুবে ভানুশ্বর।
এক দিকে উদয়রে ভানু চৌদিকে পশর।।
দক্ষিণে বন্দনা গো করলাম ক্ষীর নদী সাগর।
যেখানে বানিজজি করে চান্দ সদাগর।।
উত্তরে বন্দনা গো করলাম কৈলাশ পর্বত।
যেখানে পড়িয়া গো আছে আলীর মালামের পাথথর
পশ্চিমে বন্দনা গো করলাম মক্কা এন স্থান।
উরদিশে বাড়ায় ছেলাম মমিন মুসলমান।
চাইর কুনা পিরথিমী গো বইন্ধ্যা মন করলাম স্থির।
সুন্দরবন মোকামে বান্দলাম গাজী জিন্দাপীর
আসমানে জমিনে বান্দলাম চান্দে আর সুরুয।
আল্লার কালাম বান্দলাম কিতাব আর কুরান।।
কিবা গান গাইবাম আমি বন্দনা করলাম ইতি।
উস্তাদের চরণ বন্দলাম করিয়া মিনতি।।

এই বন্দনার পর মূল পালাগান শুরু হয়। গ্রামের নারী-পুরুষ, আবালবৃদ্ধবণিতা গভীর আগ্রহে পালাগান উপভোগ করেন। এসব কাহিনির সাবলীল বর্ননা, গ্রামীণ-জীবন ও বাস্তবতা নির্ভর রচনা এসব পালার মূল আকর্ষণ। ‘দেওয়ানা মদিনা’ পালার রচয়িতা ছিলেন মনসুর বয়াতী, ‘ছুরত জামাল’ এর রচয়িতা ফকির ফৈজু, ‘কেনারামের পালা’র রচয়িতা চন্দ্রাবতী। এইসব পালাকারের রচিত পালা আমাদের লোক-সংস্কৃতির অমূল্য নিদর্শন।

পঞ্চরত্নের এবার ময়মনসিংহের স্থাপত্য পুরাকীর্তি দেখার পালা। প্রথমেই তারা গেল শশী লজে।

শশী লজ

মুক্তাগাছার জমিদার বংশের উত্তরসূরি মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী এই দ্বিতল প্রাসাদ নির্মাণ করেন। প্রাসাদের প্রবেশ মুখে রয়েছে গ্রিক-ব্রিটিশ মিশ্র স্থাপত্যধারায় নির্মিত অর্ধবৃত্তাকার খিলান ও ১৬টি স্তম্ভ বিশিষ্ট প্রবেশ তোরণ। তোরণের নিচের ৮টি স্তম্ভ ডোরিক কলাম ও উপরের ৮টি করিন্থিয়ান কলামের সমাহারে করা। প্রাসাদের দিকে যেতে চোখে পড়ে সবুজ ঘাসের উপর চমৎকার বাগান। তার মাঝখানে অলংকৃত মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরি ঝরনার মধ্যে রয়েছে গ্রিক সৌন্দর্য দেবী ভেনাসের ভাস্কর্য। মূল ভবনের সম্মুখভাগের চূড়ায় ব্রিটিশ স্থাপত্যরীতিতে করা ত্রিভুজ আকৃতির পেডিমেন্ট। প্রধান তোরণ ও মূল ভবনেও ডোরিকি-করিন্থিয়ান মিশ্রণ

কলাম লক্ষণীয়। প্রাসাদের অভ্যন্তরে কাঠের মেঝের বলরুম, সাজসজ্জার ঝাড়বাতি। দরজা, জানালায় রয়েছে রঙিন কাঁচের চমৎকার অলংকরণ।

এবার শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা দেখার পালা।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা শুরু হয় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের হাত ধরে। তিনি বাংলাদেশের আধুনিক শিল্প আন্দোলনের অগ্রগামী শিল্পী। শিল্পীর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে ময়মনসিংহ জেলার ব্রহ্মপুত্র

নদীর তীরে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সংগ্রহশালায় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের অনেক শিল্পকর্ম রয়েছে। তাছাড়া শিল্পীর ব্যবহার করা ইজেল, খাট, কাপড়-চোপড়, তুলিসহ নানা রকমের ব্যবহার্য সামগ্রী রয়েছে এখানে। সংগ্রহশালার তত্ত্বাবধানে এখানে শিশুদের জন্য একটি আর্ট

স্কুল পরিচালিত হয়। সপ্তাহে দুইদিন শিশু শিল্পীদের আনাগোনায় মুখরিত থাকে এ স্কুল। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ছবিগুলো সামনা সামনি দেখতে পেয়ে পঞ্চরত্ন অভিভূত হয়ে গেল।

বিজয়’৭১

মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য বিজয়’৭১ দেখার জন্য তারা সবাই বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে গেল। মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদসহ সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সর্বস্তরের মানুষের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে স্মরনীয় করে রাখতে নির্মিত হয়েছে বিজয়’৭১ স্মারক ভাস্কর্যটি ।

ভাস্কর্যে একজন কৃষক, একজন নারী ও একজন ছাত্রসহ মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মপ্রত্যায়ী ভঙ্গিকে ফুটিয়ে তোলা

হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া কৃষক বাংলাদেশের পতাকা তুলে ধরেছে আকাশের দিকে। ছাত্র-মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধে অংশ নেওয়ার দিনগুলো স্মরণ করে তেজোদীপ্ত চিত্তে দাঁড়িয়ে আছে। একজন সংগ্রামী নারী রাইফেল হাতে দৃঢ় চিত্তে আহবান করছে।

ভাস্কর্যের মূল বেদীর দেয়াল জুড়ে আছে পোড়ামাটিতে (টেরাকোটা) খোদাই করা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্বলিত নানান ঘটনাবলী। ভাস্কর্যটি নির্মাণ করেছে শিল্পী শ্যামল চৌধুরী। শিক্ষার্থী, দর্শনার্থীসহ নতুন প্রজন্মের জন্য দেশপ্রেম ও ঐক্যের মূর্ত প্রতীক হয়ে আছে ভাস্কর্যটি ।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যায়ের ভাস্কর্য বিজয়'৭১ দেখার পর তারা পাশেই ব্রহ্মপুত্র তীরে গেল। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ছবি আঁকার প্রিয় জায়গা হলো এই ব্রহ্মপুত্র তীর। নদীতে রঙিন পালতোলা নৌকাসহ প্রাকৃতিক

দৃশ্য দেখে পঞ্চরত্ন অভিভূত। আকাশ গভীর মনোযোগ দিয়ে সে দৃশ্য পেনসিলে স্কেচ করে নিল। এই সময় সে বলল এইসব স্কেচগুলো ফিরে গিয়ে জলরঙে আঁকার অনুশীলন করব, যাতে আমিও একদিন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের মতো জলরঙে দক্ষতা অর্জন করতে পারি।

আগুন, আকাশ ও ইরা পুরাকীর্তি দেখার সময় প্রাসাদের দেয়ালে, দরজা, জানালায় ও কলামে যে সমস্ত নকশা দেখেছে সেগুলো বন্ধুখাতায় এঁকে রেখেছে।

এবার তাদের যাত্রার গন্তব্য হলো চা'য়ের দেশ সিলেট। ময়মনসিংহকে বিদায় জানিয়ে তারা সিলেটের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করল।

এই অধ্যায়ে আমরা যা করব –

- প্রাকৃতিক বা জ্যামিতিক আকৃতি দিয়ে মোটিফ তৈরি করে তা দিয়ে নকশা তৈরি করব। সেলাইয়ের ফোঁড়ের মতো করে নকশায় নানা রঙের কলম অথবা পোস্টার রং দিয়ে রং করব। সম্ভব হলে কাপড়ে সুঁই সুতা দিয়ে নকশা ফুটিয়ে তুলব।
- এই অধ্যায়ে দেওয়া নকশীকাঁথা সেলাইয়ের বিভিন্ন ফোঁড়গুলো অনুশীলন করব।
- বইয়ে দেওয়া শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জলরং এ আঁকা নদী ও নৌকা অনুসরণে ইচ্ছামত নদী-নৌকার ছবি আঁকব।
- পালাগান সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব। সাথে সাথে নিজেদের আশেপাশে কোন পালাগানের শিল্পী যদি থাকে তাহলে তাঁর সাক্ষাৎকার নিব এবং শিল্পীর অনুমতি সাপেক্ষে তা মোবাইল ফোনে ধারন করব এবং তথ্য বন্ধুখাতায় লিখে রাখব।
- গাজী আলিমদ্দিন মান্নান এর জীবন ও কর্মসম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব।

সুরমা নদীর তীরে

ব্রহ্মপুত্র পাড়ের শহর ময়মনসিংহ থেকে পঞ্চরত্ন রওনা হলো সুরমা তীরের শহর সিলেটের উদ্দেশে। আধ্যাত্মিক নগর ও পুণ্যভূমি হিসেবে পরিচিত সিলেটকে প্রকৃতি কন্যাও বলা হয়। একদিকে পাহাড়, নদী, ঝরনার অপরূপ ছন্দময় অবস্থান আর অন্যদিকে প্রাকৃতিক সম্পদ গ্যাস, পাথর সিলেটকে করেছে সমৃদ্ধ।

পঞ্চরত্নের এবারের সিলেট ভ্রমণে একটা বাড়তি পাওয়া হচ্ছে ইরার চাচাত বোনের বিয়ে। তাই তারা খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় ছিল সবাই মিলে কবে সিলেটে গিয়ে পৌঁছাবে। ইরার চাচার পরিবার হবিগঞ্জে থাকে। ইরা আগেও সিলেটে কয়েকবার গেছে। সিলেট সম্পর্কে ইরার সংগ্রহ করা তথ্য থেকে বাকিরা সিলেট সম্পর্কে জানল।

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত সিলেট বিভাগ। সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ চারটি জেলা নিয়ে গঠিত এ বিভাগ। ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ৩৬টি নদী রয়েছে সিলেট বিভাগে, যার মধ্যে অন্যতম প্রধান নদী সুরমা আর কুশিয়ারা। বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক রূপ সিলেটকে করেছে অনন্য। তাই ভ্রমণ পিপাসুদের আকৃষ্ট করে সিলেট।

সিলেটের গর্ব সিলেটের নিজস্ব লিপি নাগরি। নাগরিলিপিতে রচিত হয়েছে গল্প, উপন্যাস, কবিতা। নিচে একটি কবিতার দুটি লাইন—

"ওহে মন বুইদধি জদি থাকে তর মাজে
মিলিওনা তুমি কভু নাদান শমাজে..."

সিলেটি ভাষার লিখিত রূপের স্মৃতি ধরে রাখতে সিলেট শহরে সুরমা নদীর কাছে নির্মিত হয়েছে নাগরি চত্বর। ভ্রমণ পরিকল্পনা অনুসারে পঞ্চরত্ন সিলেট হয়ে হবিগঞ্জে পৌঁছাল। কারণ ইরার বোনের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে তাদের অংশগ্রহণ করতে হবে। চাচার পরিবারের সাথে কথা বলে তারা ঠিক করে অনুষ্ঠানে বৃহত্তর সিলেটের ঐতিহ্যবাহী ধামাইল নাচ করবে। এর মধ্যে আগুন বলল বিয়ের কথা হলে আমার খাবারের কথা মনে পড়ে। সে কথা শুনে ইরার চাচা হাসলেন। আগুন চাচার কাছে স্থানীয় খাবার সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি খাবার সম্পর্কে বললেন।

সিলেটের খাবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো শাতকড়া বা সাতকরা যাকে সিলেটি ভাষায় হাতকড়া বলে, একটি লেবু বা টক জাতীয় ফল। শাতকড়া একটি ঐতিহ্যবাহী রান্নার উপাদান। মাংস, সবজি ইত্যাদি নানা পদের খাবার রান্নায় স্বাদ আর ঘ্রাণ বাড়াতে ব্যবহার হয় শাতকড়া। এছাড়াও সিলেট অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য ও জনপ্রিয় খাবারের তালিকায় রয়েছে আখনি, হাঁস-বাঁশ, তুষা শিরনী, আখনি বিরিয়ানি, চুঙ্গাপিঠা। ঐতিহ্যে আগ্রহী ইরা জানতে চায় হাঁস-বাঁশ কি। চাচা বলেন, হাঁস আর বাঁশ তোমরা চেন। কচি বাঁশকে বলে কোড়ল। হাঁস রান্না করে কোড়ল কুচি করে তাতে দিয়ে যে নান্না তা ই হাঁস-বাঁশ। চুঙ্গাপিঠা (bamboo rice cake) তৈরি করা হয় বিশেষ ধরনের চাল ভিজিয়ে। নরম করে তা বাঁশের টুকরায় বা চোঙ্গায় ভরে ভাপে রান্না করতে হয়। দেখতে তাই নলাকৃতির হয়। এই পিঠা দুধের মালাই, খেজুরের গুড়, দুধের সর দিয়ে খেতে খুব মজা। সিলেটের ঐতিহ্যবাহী খাবারের গল্পের সাথে আয়োজিত খাবারের পর্ব শেষ হল। এবার সবাই মিলে গায়ে হলুদে পরিবেশনের জন্য গানের সাথে ধামাইল নাচ অনুশীলনের প্রস্তুতি নিতে লাগল।

ধামাইল নাচ
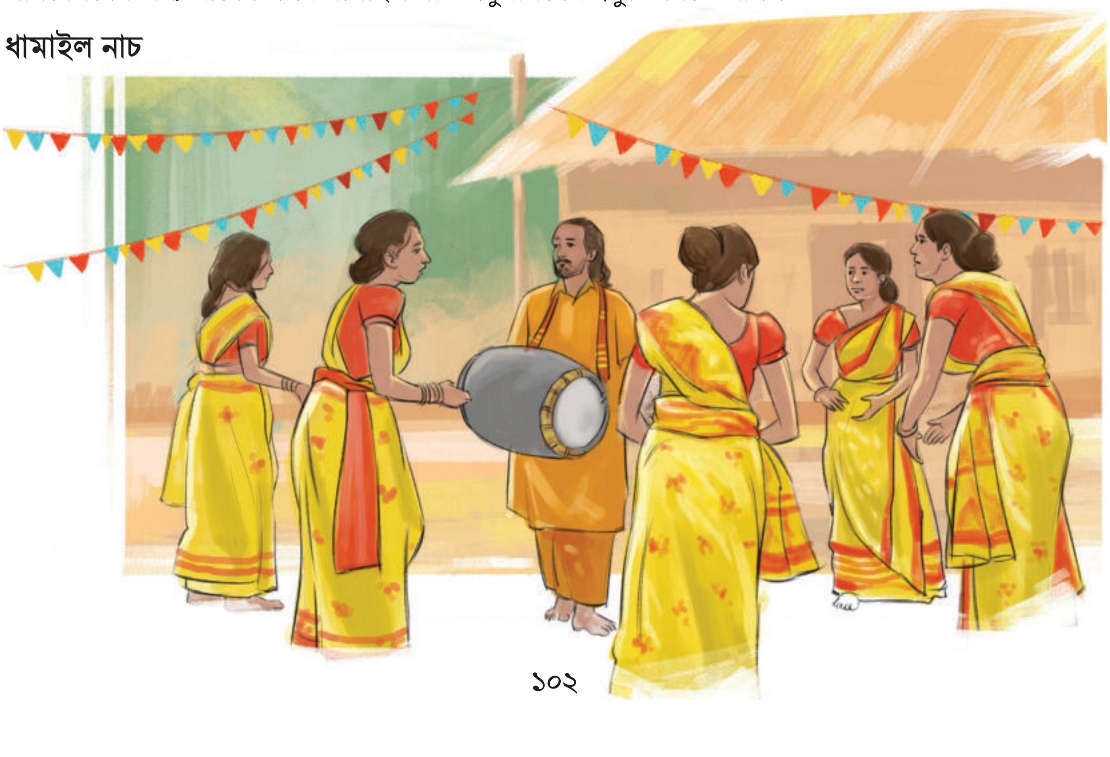
বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের বাংলার লোকনৃত্যের একটি প্রচলিত নাম ধামাইল। ধামাইল গান মূলত সামাজিক অনুষ্ঠানে হয়ে থাকে। বিশেষ করে বিয়ের আসরে পাকা দেখা থেকে বধূবরণ অনুষ্ঠানে গ্রামের নানা বয়সের মেয়েরা এই নৃত্যটি পরিবেশন করে। ধামাইল নাচের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হলো, করতালি সহযোগে বৃত্তাকারে মহিলাদের নৃত্যভঙ্গিমা। এই নৃত্যটি গীতপ্রধান বা গীতনির্ভর- এমনটি বলেছেন বাংলার লোকনৃত্যবিদ মুকুন্দদাস ভট্টাচার্য। তিনি আরও বলেছেন এই পরিবেশনায় মূখ্য বিষয় পাঁচটি- করতালি, অঙ্গচালনা, পদচালনা, হস্তচালনা এবং শিরচালনা।

ধামাইল নাচের পরিবেশনারীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো—

এটি মূলত নারী পরিবেশিত সমবেত নৃত্য। পুরো পরিবেশনাটি বৃত্তাকারে পরিবেশিত হয়ে থাকে। এই নাচে তাল-লয়ের আধিক্য দেখা যায়, তবে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার খুব সীমিত আকারে হয়। মহিলারা নিজে গান গেয়ে এবং হাতে তালি দিয়ে তাল রক্ষা করে থাকে। বিয়ের আসরে পাড়া-প্রতিবেশীগণ, বর-বধূকে সুন্দর করে সাজিয়ে মাঝখানে রেখে চারপাশে বৃত্তাকারে প্রদক্ষিণ করে। নারীদের দ্বারা পরিবেশিত বলে নৃত্যের ভঙ্গিমা শুধু কমনীয়, লাস্যময়ী নয়, সেইসাথে উদ্দীপ্ত এবং বলিষ্ঠও বটে।

করণকৌশল-

এই নাচটি সম্পূর্ণভাবে বৃত্তাকারে পরিবেশিত হতে হবে। পরিবেশনা রীতি অনুযায়ী বৃত্তটি সবসময় ডান দিকে আবর্তন করবে। পরিবেশনাটি শুরু হওয়ার সময় বিলম্বিত লয়ে হয়ে থাকে। ধীরে ধীরে লয় বৃদ্ধি হয়ে পুনরায় তা ধীর লয়ে ফিরে আসে। পদক্ষেপ দেওয়ার সময় শরীর ঝুঁকে শুরু হবে এবং প্রতি ৩ মাত্রায় তা ক্রমান্বয়ে ঝোঁকা অবস্থা থেকে তালি দিতে দিতে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। সাধারণত ধামাইল নাচে এধরনের করণকৌশল হয়ে থাকে। এছাড়াও, বিভিন্ন ধরনের পরিবেশনারীতি দেখা যায়।

এই পাঠে আমরা যে ভাবে ধামাইল নাচ অনুশীলন করব

- ৮-১০ জন করে দল গঠন করব।
- প্রতি দল নিচের কোনো একটি গান বেছে নিবে ।
- দলের মধ্যে যারা গান গাইতে পারে তারা গান গাইবে। সেই সাথে বাকিরা নাচের ভঙ্গি করবে।
- 'লীলাবালী লীলাবালী বর ও যুবতি সইগো' 'বিয়ার সাজনি সাজো কন্যা লো'।

বিয়ে বাড়িতে তারা নাচ গানের চর্চা করে এবং পরে তা গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে পরিবেশন করে। বিয়ের অনুষ্ঠানের পরদিন তারা গেল সুনামগঞ্জ জেলায় বিশিষ্ট মরমি কবি হাসন রাজা সম্পর্কে জানতে।

সুনামগঞ্জ জেলা শহরের উত্তর পশ্চিমে তেঘরিয়ায় অবস্থিত হাসন রাজার বাড়ি ও মিউজিয়াম। এখানে সংরক্ষিত আছে হাসন রাজার খড়ম, পোশাক, তলোয়ার, চেয়ার এবং স্মৃতি বিজড়িত নানা জিনিস ও তথ্য। এগুলোর মাঝেই ছড়িয়ে আছে তাঁর মরমি দর্শনের চিহ্ন।

মিউজিয়াম পরিদর্শনে গিয়ে তারা হাসন রাজার পরিবারের একজন সদস্যের দেখা পায়। তিনি পঞ্চরত্নের আগ্রহ দেখে মুগ্ধ হন। তাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ও তথ্য দিয়ে তাদের ভ্রমণকে আনন্দময় ও অর্থপূর্ণ করে তোলেন।

হাসন রাজা

হাসন রাজার জন্ম ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন লক্ষণশ্রী পরগনার তেঘড়িয়া গ্রামে। যা বর্তমান সুনামগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। তিনি ছিলেন জমিদার পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতা দেওয়ান আলী রাজা চৌধুরী ছিলেন একজন প্রতাপশালী জমিদার। মা হুরমতজান বিবি।

হাসন রাজার আবির্ভাব বাংলার লোকসংস্কৃতিকে করেছে সমৃদ্ধ। তিনি একাধারে গান রচনা করতেন, সুর করতেন ও সংগীত পরিবেশন করতেন। তিনি মানবপ্রেমের গান রচনা করেছেন। তাই তিনি মানবতাবাদী। আবার স্রষ্টা প্রেমে বিলীন হয়েছেন তাই তিনি মরমিবাদী। তাঁর রচিত 'হাসন উদাস' 'হাসন রাজার তিনপুরুষ' 'হাসন বাহার' ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে তাঁর গান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। 'আল ইসলাম' নামক পত্রিকায় ও অন্যান্য পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য গান প্রকাশিত হয়েছে।

অতি কম বয়সে পিতাসহ পরিবারের অনেক সদস্যকে হারিয়ে তিনি বুঝতে পারেন এ জগৎ সংসার আসলে অল্প দিনের। এই ভাবনা তাঁর সৃষ্টকর্মে উঠে আসে নানা ভাবে। তিনি লিখেন—

আমি যাইমুরে যাইমু আল্লার সংঙ্গে

হাসন রাজা আল্লাহ বিনে কিছু নাহি মাঙ্গো

জীবনযাপনে অতিসাধারণ হাসন রাজা জীবনকে দেখেছেন বর্ণিল করে। তাঁর ছেলেবেলা কেটেছে সুনামগঞ্জের অপরূপ প্রকৃতির রূপ-রস আস্বাদন করে। জমিদার পুত্র হয়েও খাল-বিল-জঙ্গালে ছুটে বেড়িয়েছেন সাধারণ শিশুদের মতোই। পোশাক পরিচ্ছদে ছিলেন সাদামাটা। মাটির ঘরে থাকতেন। তিনি মনে করতেন এ জগৎ সংসারের মালিক আল্লাহ। একবার উত্তর ভারত থেকে আসা একদল পর্যটক তাঁর কাছে জানতে চান তাঁর ঘড়বাড়ির এই দৈন্যদশা কেন? উত্তরে তিনি বলেন এঘর বাড়ি কোনো কিছুর মালিক তিনি নন। আর তাঁর এ কথা ধ্বনিত হয় তাঁর রচনায়—

লোকে বলে বলেরে
ঘর-বাড়ি ভালা নাই আমার
কি ঘর বানাইমু আমি শূন্যেরও মাঝার।।
ভালা কইরা ঘর বানাইয়া
কয়দিন থাকমু আর
আয়না দিয়া চাইয়া দেখি
পাকনা চুল আমার।।
এ ভাবিয়া হাসন রাজা
ঘর-দুয়ার না বান্ধে
কোথায় নিয়া রাখব আল্লায়
তাই ভাবিয়া কান্দে।।
জানত যদি হাসন রাজা
বাঁচব কতদিন
বানাইত দালান-কোঠা
করিয়া রঙিন।।

হাসন রাজা মিউজিয়াম পরিদর্শনের পর পঞ্চরত্ন গেল শীতল পাটির গ্রাম কমলগঞ্জে। কমলগঞ্জ ছাড়াও এ জেলার রাজনগর, বালাগঞ্জ, বড়লেখা প্রভৃতি অঞ্চলে নকশি শীতল পাটি তৈরি হয়।

শীতল পাটি

শীতল পাটির ঐতিহ্য প্রায় হাজার বছরের। বিয়েসহ নানান অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে শীতল পাটি উপহার দেওয়ার প্রচলন দীর্ঘদিনের। মেঝেতে, খাট বা চৌকিতে বিছানোর জন্য বেতের এক ধরনের আসন হলো শীতল পাটি। গরমের দিনে এই আসন শীতলতার প্রশান্তি এনে দেয়। গ্রামে এটি বিছানার চাদর বা মাদুর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সিলেটের শীতল পাটির সুনাম সারা বিশ্বে। এ ছাড়া চট্টগ্রাম, ঝালকাঠি, পটুয়াখালি, সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইলেও শীতল পাটি তৈরি হয়। বিছানার চাদর থেকে সাজসজ্জার উপকরণ, ডাইনিং টেবিলের ম্যাট, চশমার খাপ, চটের থলে ইত্যাদিতে শীতল পাটি ব্যবহৃত হচ্ছে।

যারা পাটি বুনে তাদেরকে পাটিয়ারা বা পাটিকর বলে। বংশপরম্পরায় পাটিয়ারা সুনিপুণভাবে শীতল পাটি তৈরি করে আসছে। মুর্তা গাছের ছাল অর্থাৎ চামড়া দিয়ে শীতল পাটি তৈরি করা হয়। এই গাছকে গোড়া থেকে কেটে পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়। এরপর দা দিয়ে চেঁছে অতি পাতলা করে ছাল ছড়িয়ে নেওয়া হয়। পাতলা ছাল বা বেতিকে মসৃণ ও সাদা করার জন্য ভাতের মাড়, গেওলা, কেওড়া, জারুল, আমড়া ইত্যাদির পাতা সিদ্ধ করে ডুবিয়ে রাখতে হয়। পরে এই বেত দিয়ে শীতল পাটি বুনা হয়। বুনন ও নকশার নিপুনতার তারতম্যে নানা নামের শীতল পাটি তৈরি হয়, যেমন- সিকি, আধুলি, টাকা, নয়নতারা, লাল গালিচা অন্যতম। এছাড়া পৌরাণিক কাহিনিচিত্র, বাঘ, হরিণ, কলাগাছ, ফুল-লতা-পাতা, জ্যামিতিক নকশা ইত্যাদি চিত্রিত করেও নকশি শীতল পাটি তৈরি হয়। ইউনেস্কো ২০১৭ সালে সিলেট অঞ্চলের শীতল পাটিকে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে।

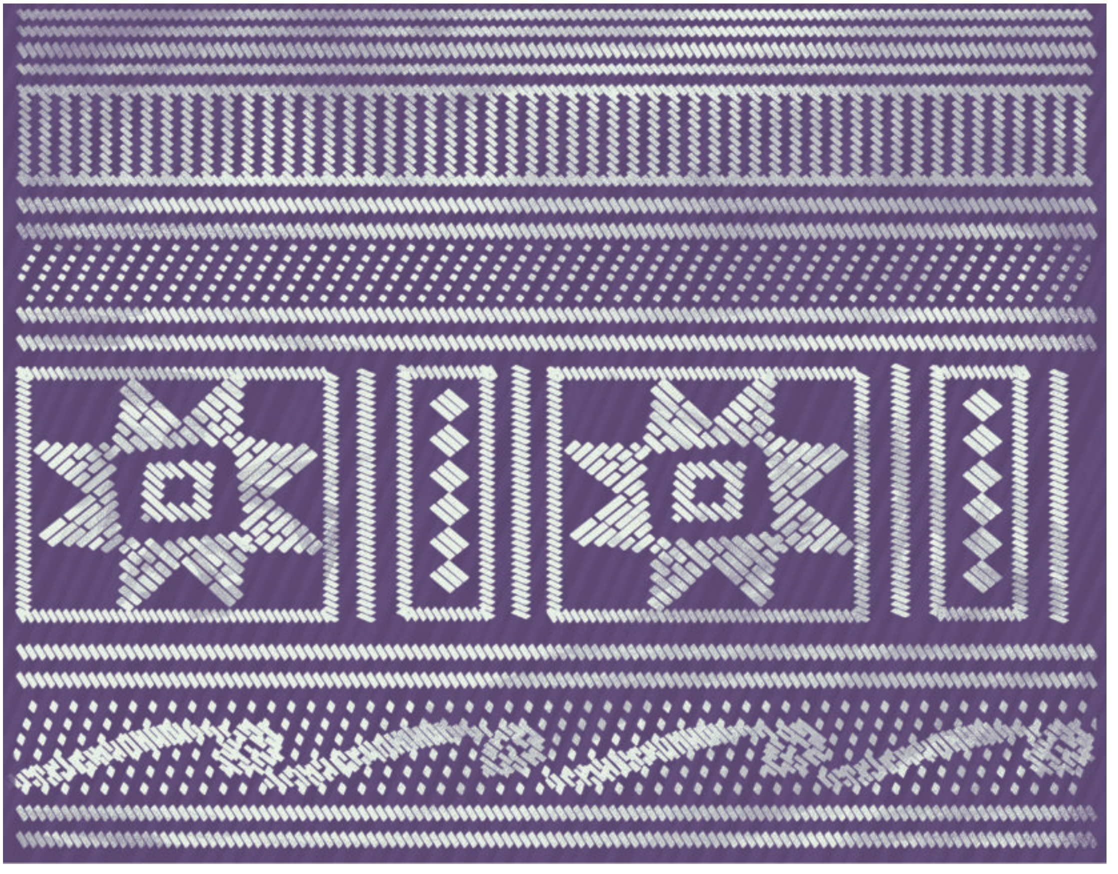

এই পাঠে কাগজের ফিতা দিয়ে আমরা উপহার সামগ্রীর প্যাকেটের জন্য কাগজের পাটি বানাব

এই কাজটি করার জন্য আমাদের প্রয়োজন হবে কিছু কাগজ, একটি ছোট কাঁচি আর সামান্য আঠা এবং পোস্টার রং।

- প্রথমে আমরা ১ ফুট লম্বা আর ইঞ্চি ছওড়া করে ২৪ টুকরো কাগজের ফিতা কেটে নেবো।
- ১২টি কাগজের ফিতা সামনে দিকে সমান লাইন করে বিছিয়ে নিব। যেটাকে আমরা বলব টানার দিক।
- ১২টি কাগজের ফিতা রাখব পাশাপাশি বুননের জন্য। এইটাকে আমরা বানার দিক বলব।
- টানার দিকের ১২টি কাগজের ফিতার ভেতর দিয়ে বানার দিকের ১২টি কাগজের ফিতা থেকে একটা একটা করে পার করাব। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে বানার দিকের কাগজের ফিতা প্রথম লাইনে টানার উপর দিয়ে পার করলে পরের লাইনে তা টানার নিচ দিয়ে পার করাতে হবে।
- এভাবে পাটির মতো করে আমরা সম্পূর্ণ বোনা শেষ করব। তবে মনে রাখতে হবে মূল পাটি বোনা হয় কোনাকুনি ভাবে। আমাদের কাগজ পাটিটি আমরা বুনব সোজাসুজি ভাবে।
- বুনার শেষে বানার নিচের ফিতাটি এবং উপরের ফিতাটি অল্প আঠা দিয়ে টানার ফিতাটির সাথে আটকে দেবো। এতে বোননটি খুলে যাবে না।

- এবার বুননের মাঝের অংশের ছক ধরে ইচ্ছামতো রং করে আমরা মনের মতো নকশা করতে পারি।
- এইভাবে কাগজ পাটি তৈরি করে খুব সহজে আমরা উপহার সামগ্রী প্যাকেট করে প্রিয়জনদের দিতে পারি।

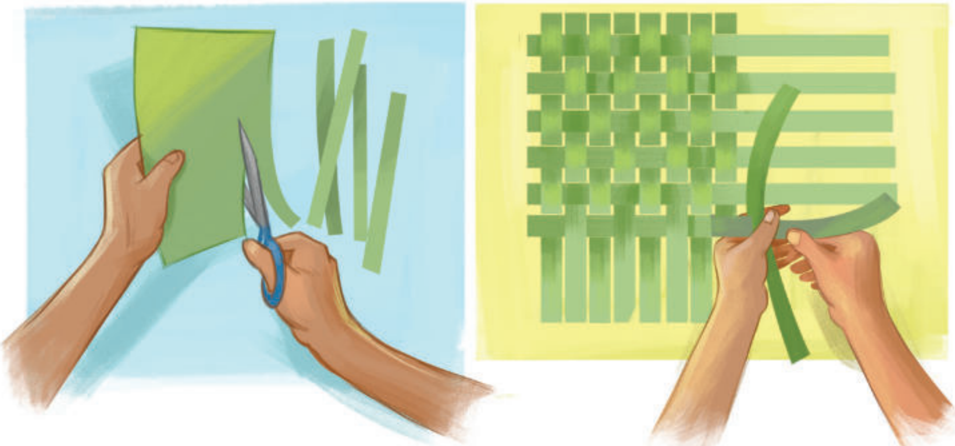

কাগজের ফিতা দিয়ে পাটি তৈরির নকশা

কমলগঞ্জের শীতল পাটির গ্রাম দেখে তারা জৈন্তিয়া পাহাড়, জাফলং, বিছানাকান্দি, চা বাগান, রাতারগুল, শ্রী শ্রী দুর্গাবাড়ি মন্দির, মণিপুরি রাজবাড়ি প্রভৃতি জায়গা ভ্রমণ করে। তারা গেল হাকালুকি হাওড় ভ্রমণে।

হাকালুকি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ হাওড়। এটি এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম মিঠাপানির জলাভূমি। হাকালুকি হাওড় মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা, কুলাউড়া, সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ এবং বিয়ানীবাজার জুড়ে বিস্তৃত। শীতকালে পরিযায়ী পাখিদের বিচরণ হয় এই এলাকায়। হাকালুকি হাওড়ের খসড়া স্কেচ তারা তাদের বন্ধুখাতায় করে নিল। এরপর তারা গেল মুক্তিযুদ্ধ ভাস্কর্য চেতনা’৭১ দেখতে।

চেতনা’৭১

চেতনা’৭১ মুক্তিযুদ্ধের স্মরণে নির্মিত সিলেটের প্রথম মুক্তিযুদ্ধ ভাস্কর্য। এটি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্মিত হয় ২০০৯ সালে। চেতনা’৭১ এর একটি বিশেষত্ব হলো শিক্ষার্থীরা প্রথম একটি অস্থায়ী ভাস্কর্য নির্মাণ করে। **পরবর্তীতে** স্থায়ী ভাস্কর্য নির্মিত হয়। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনের সাথে মিল রেখে লাল ও কালো ইটে তৈরি করা হয়। ভাস্কর্যের নকশা প্রণয়ন এবং নির্মাণ সম্পন্ন করেন শিল্পী মোবারক হোসেন নৃপাল।

৩টি ধাপের উপর মূল বেদি এবং তার উপর ফিগারটি। নিচ থেকে প্রথম ধাপের ব্যাস ১৫ ফুট, দ্বিতীয় ধাপের ব্যাস সাড়ে ১৩ ফুট, উপরের ধাপের ব্যাস ১২ ফুট। ধাপ ৩টি দশ ইঞ্চি করে উঁচু। এই ধাপ ৩টির উপরে রয়েছে ৪ ফুট উঁচু বেদি। তার উপর ৮ ফুট উঁচু ফিগার।

ভাস্কর্যটিতে রয়েছে দুজন শিক্ষার্থী । জাতীয় পতাকা উঁচুতে তুলে ধরার ভঙ্গিমায় একজন ছাত্র এবং সংবিধানের প্রতীকী বই হাতে একজন ছাত্রী দাঁড়িয়ে। দেখে মনে হয় নির্ভীক প্রহরীর মতো বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষায় মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান আর দেশের প্রতি গভীর ভালবাসা নিয়ে পঞ্চরত্ন যাত্রা করল দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে।

এ অধ্যায়ে আমরা যা করব—

- বইয়ে দেয়া নির্দেশনা এবং ছবি দেখে কাগজের ফিতা দিয়ে উপহার সামগ্রীর প্যাকেটের জন্য কাগজের পাটি বানাব এবং তাতে রঙ দিয়ে নকশা করব।
- বইয়ে দেয়া নির্দেশনা অনুসরন করে উল্লেখিত গানের সাথে করনকৌশল অনুসরণ করে ধামাইল নৃত্য অনুশীলণ করব।
- বইয়ে দেওয়া মরমি কবি হাসন রাজার ‘লোকে বলে বলেরে’ গানটি নিজেদের মতো করে গাওয়ার চেষ্টা করব।
- মরমি কবি হাসন রাজার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আরও জানব এবং হাসন রাজার গানগুলো চর্চা করব।

ইরার মা অফিসের কাজে কক্সবাজার গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ইরার জন্য একটা ঝিনুকের মালা নিয়ে এসেছেন। ইরা বন্ধুদের মালাটা দেখাতে নিয়ে এলো।

কি সুন্দর না মালাটা! ঝিনুক দিয়ে মালা হয় এটা আমি জানতাম না, বলল আগুন।

অবনী বলল ঝিনুক দিয়ে মালা ছাড়া আরও অনেক কিছু হয়। ঝিনুকশিল্প বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনাময় কুটিরশিল্প। সমুদ্র সৈকত থেকে কুড়িয়ে পাওয়া শামুক ঝিনুক দিয়ে ঘর সাজানোর কত কিছু যে তৈরি করা যায়! আবার বিভিন্ন প্রকার ঝিনুকের ভেতর মুক্তা পাওয়া যায়। মুক্তা দিয়েও অনেক রকমের গয়না তৈরি হয়। মুক্তা আহরণের জন্য অনেক জায়গায় ঝিনুকের চাষও হয়ে থাকে। সমুদ্র হল অপার বিস্ময় আর সম্ভাবনার মিলিত রূপ।

সমীর বলল- আমি কখনও সমুদ্রে যাইনি। সমুদ্রের ঢেউ দেখিনি, তার বিশালতা উপভোগ করিনি, শুধু টিভিতে দেখেছি। শুনেছি কর্ণফুলী নদীর তীরে গড়ে উঠেছে চট্টগ্রাম শহর। ফলে এই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিতে কর্ণফুলী নদীর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামও এই নদীর অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন-

-ওগো ও কর্ণফুলী

তোমার সলিলে পড়েছিল কবে কার কান-ফুল খুলি?

তোমার স্রোতের উজান ঠেলিয়া কোন তরূণী কে জানে,

'সাম্পান'-নায়ে ফিরেছিল তার দয়িতের সন্ধানে?

আনমনা তার খুলে গেল খোঁপা, কান- ফুল গেল খুলি,

সে ফুল যতনে পরিয়া কর্ণে হলে কি কর্ণফুলী?

আকাশ বলল চল, এবার আমরা সবাই বাস্তব তথ্য আর কল্পনার ভ্রমণ মিলিয়ে চট্টগ্রাম ঘুরতে যাব। রেল, সড়ক, আকাশপথ তিনভাবেই সিলেট থেকে চট্টগ্রাম যাবার ব্যবস্থা আছে। সিলেট থেকে চট্টগ্রাম যাবার ট্রেনগুলো হলো - উদয়ন এক্সপ্রেস এবং পাহাড়িকা এক্সপ্রেস। কল্পনার ট্রেনে চেপে তারা যাবে চট্টগ্রামে। সেখানে থাকে ইরার ছোট খালা। পঞ্চরত্নের চট্টগ্রামে বেড়ানোর আগ্রহের কথা শুনে ইরার ছোট খালা খুবই আনন্দের সাথে তাদের আমন্ত্রণ জানালেন। ছোটখালার মেয়ে ফাইজা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যকলা বিভাগে পড়ে। পঞ্চরত্ন আসছে শুনে ফাইজা আপু নিজে থেকে বলল, তাদের চট্টগ্রাম ঘুরে দেখাবে।

কর্ণফুলী নদী তীরের জনপদ বন্দর নগরী চট্টগ্রাম। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত চট্টগ্রাম বিভাগ ১১টি জেলা নিয়ে গঠিত। যার মধ্যে রয়েছে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি চট্টগ্রাম হলো পাহাড়, নদী, সমুদ্রের এক অপূর্ব মিলনক্ষেত্র।

সিলেট থেকে সময়মতো কল্পনার ট্রেনে তারা চট্টগ্রাম রেলস্টেশনে এসে পৌঁছাল। রেলস্টেশনে পঞ্চরত্নের জন্য অপেক্ষা করছিলেন ফাইজা আপু আর তার বন্ধু মেরি তঞ্চঞ্জ্ঞা। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার শিক্ষার্থী। তারা রেলস্টেশনে সবাইকে অর্ভ্যথনা জানাল। অবনী ফাইজা আপুকে বললেন, আমি একটা লেখাতে পড়েছিলাম চট্টগ্রাম রেলস্টেশনটি ব্রিটিশ সময়ে নির্মিত। কিন্তু এই রেলস্টেশনটাতো বর্তমান সময়ের স্থাপত্য শৈলিতে তৈরি। ফাইজা আপু হেসে উত্তর দিলেন তুমি ঠিক বলেছ, এটা নতুন ভবন। এর পাশেই রয়েছে সেই ব্রিটিশ সময়ের স্থাপত্য নিদর্শন সম্বলিত পুরনো স্টেশনটি। এবার তাহলে চল সেটা দেখে আসি।

স্থানীয় মানুষের কাছে এটা বটতলী রেলস্টেশন নামেও পরিচিত। বটতলী রেলস্টেশনে পৌঁছানোর পর ফাইজা আপু বললেন ভবনটি সংস্করণের পরে বর্তমানে এতে কার্যক্রম চলছে। লাল পাথরে তৈরি দ্বিতল ভবনটিতে মাঝখানে একটি এবং দুপাশে দুটি ছোট গম্বুজ রয়েছে। শত বছরের বেশি প্রাচীন এই ভবনটি দেখলে তার জৌলুস বুঝা যায়।

স্টেশনের ভেতরে প্লাটফর্মে গিয়ে তারা অনেক রঙে রাঙানো একটা ট্রেন দেখতে পেল। সমীর ফাইজা আপুকে জিজ্ঞাসা করলেন এই সুন্দর ট্রেনটি কোথায় যায়? তিনি বললেন এইটা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী শাটল ট্রেন। যেটাতে করে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা চট্টগ্রাম শহর থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে যাতায়াত করি।

সেন্ট্রাল রেলওয়ে বিল্ডিং

স্টেশন থেকে বের হয়ে তারা গেল উপমহাদেশের ব্রিটিশ সময়ের স্থাপনার অন্যতম নিদর্শন সি, আর, বি ভবন বা সেন্ট্রাল রেলওয়ে ভবনটি দেখতে। এটি চট্টগ্রাম মহানগরীর দৃষ্টিনন্দন প্রাচীন ভবনগুলোর মধ্যে অন্যতম। ভবনটির সামনে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের একটা মডেল রাখা আছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এই এলাকায় ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই এলাকায় স্বাধীনতার যুদ্ধে শহিদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানানোর জন্য শহিদদের নাম সম্বলিত একটা স্মৃতিস্তম্ভ আছে। সি, আর, বি এলাকাটি শতবর্ষীয় বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ। এটি চট্টগ্রাম শহরের ফুসফুস নামে পরিচিত। চারদিকের ঘন সবুজ প্রকৃতির মাঝে লাল রঙের ভবনটি এক নান্দনিক স্থাপত্য নিদর্শন।

সি, আর, বি এলাকা পঞ্চরত্ন দেখতে পেল অনেক শিল্পশিক্ষার্থী বসে ছবি আঁকছে। কেউ আঁকছে গাছপালা আবার কেউ বা সি, আর, বি ভবনের ছবি। শিল্পশিক্ষার্থীরা পেনসিল স্কেচ, জলরংসহ অনেক মাধ্যমে ছবি আঁকছে। এই সকল শিল্প শিক্ষার্থীর বিষয়ে জানতে চাইলে মেরি আপু বললেন এরা সবাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনিস্টিটিউটের শিক্ষার্থী। যেহেতু চারুকলা ইনিস্টিটিউট এই এলাকা থেকে বেশি দূরে নয়, তাই শিক্ষার্থীরা এখানে তাদের আউটডোর অনুশীলনের জন্য আসে।

পঞ্চরত্ন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করল ফিরে গিয়ে তারা শিল্প ও সংস্কৃতির শিক্ষকের সহায়তায় ক্লাসের বন্ধুদের নিয়ে একদিন আউটডোর করবে। সেদিন তারা খোলা স্থানে নিজেদের মতো করে ছবি আঁকবে, গান করবে, নাচ, অভিনয়সহ শিল্পকলার যেকোনো শাখায় ইচ্ছেমতো মনোভাব প্রকাশ করবে। সেদিন প্রকৃতি হবে তাদের পাঠশালা যেখান থেকে তারা আরো বেশি কিছু জানবে, শিখবে আর নিজের খুশিমতো প্রকাশ করবে।

সি, আর, বি এলাকা থেকে বের হয়ে তারা বাসায় পৌঁছাল। ফাইজা আপু বললেন আগামী দুই দিন ধরে আমরা চট্টগ্রাম শহরে অবস্থিত বিভিন্ন স্থাপত্য নির্দশন ও ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দেখব এরপর যাব পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সবশেষে কক্সবাজার।

এরপর দুপুরে সবাই একসাথে খেতে বসল। ছোট খালা বললেন তোমাদের জন্য চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী খাবার রান্না করেছি। সমীরের জন্য রান্না করেছি কয়েক রকমের সমুদ্রের মাছ আর শুঁটকি। আর বাকিদের জন্য চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী গরুর মাংসের কালো ভুনা আর মেজবানির মাংস। আকাশ বলল তবে কি আমরা সমুদ্রের মাছ আর শুঁটকি খাব না? ছোট খালা হেসে বললতোমাদের সবার কথা বিবেচনায় রেখে আমি সব রকমের খাবার আয়োজন করেছি। তোরা যে যেটা খেতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিস সেটা নিয়ে খা।

দুপুরের খাওয়া দাওয়া শেষ করে ফাইজা আপু বললেন এইবার প্রথমে আমরা যাব জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর দেখতে। সেখানে বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠির সংস্কৃতি ও জীবনজাত্রা সম্পর্কে ধারণা পাব। সেই সাথে আরো কিছু দেশে বসবাসরত বিভিন্ন জাতিসত্তার মানুষ ও তাদের জীবন প্রণালী সম্পর্কে জানতে পারব।

জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর

চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ এলাকায় অবস্থিত জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরটি বাংলাদেশের একমাত্র জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর। এই জাদঘরে বাংলাদেশসহ ৬টি দেশের প্রায় ২৫টি জাতিগোষ্ঠীর জাতিতাত্ত্বিক সামগ্রীর প্রদর্শনীতে রয়েছে। এই জাদুঘর থেকে আমরা বাংলাদেশসহ ভারত, পাকিস্তান কিরগিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানির জাতিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারব। এই প্রদর্শিত সামগ্রীর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, বম, খিয়াং, খুমি, চাক, রাখাইন, পাংখোয়া, সিলেট অঞ্চলের খাসিয়া, মণিপুরী, পাঙন, (মুসলিম মণিপুরী), ময়মনসিংহ অঞ্চলের গারো, হাজং, দালু, মান্দাই, কোচ, রাজশাহী দিনাজপুর অঞ্চলের সাঁওতাল, ওঁরও, রাজবংশী, পলিয়া, যশোহর, ঝিনাইদহ অঞ্চলের বুনো, বা বোনা, বাগদি প্রভৃতিসহ পাকিস্তানের পাঠান, সিন্ধি, পাঞ্জাবি, কাফির, সোয়াত, ভারতের আদি, ফুওয়া, মুরিয়া, মিজো, কিরগিজিস্তানের কিরগিজ, অস্ট্রেলিয়ার অস্টাল এবং দুই জার্মানির মিলন প্রাচীরের ভগ্নাংশের কিছু নির্দশন জাদুঘরে প্রদর্শিত আছে।

জাদুঘরে তিনটি মানচিত্র ও ইতালির চিত্রশিল্পী মি. ক্যারোলির ১২টি দেওয়াল চিত্র আছে। তাছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠীসহ পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর অলংকার, বাংলাদেশের পার্বত্যজেলায় বসবাসরত ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠিদের বাসগৃহের নমুনা প্রদর্শিত আছে।

জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর পরিদর্শনের মাধ্যমে তারা বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাগুলোতে বসবাসরত এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠী সম্পর্কে ধারণা লাভ করল।

জাদুঘর থেকে পঞ্চরত্ন গেল ১৬৬৭ সালে মোঘল স্থাপত্য রীতি অনুযায়ী নির্মিত আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ দেখতে। তারপর একে একে তারা দেখল ৩০০-৩৫০ বছর পূর্বে শ্রী শ্রী চট্টেশ্বরী দেবীর মন্দির, দুর্লভ পাণ্ডুলিপিসমৃদ্ধ চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার, চট্টগ্রামের পাথরঘাটায় অবস্থিত ক্যাথলিক চার্চের অন্তর্গত ক্যাথিড্রাল, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা মাস্টারদা সূর্য সেনের অন্যতম সহযোদ্ধা বীরকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের স্মৃতি জড়িত স্থান ইউরোপিয়ান ক্লাব পরিদর্শনে।

তাছাড়া তারা স্থানীয় মানুষের সাথে কথা বলে জব্বারের বলীখেলা সম্পর্কে অনেক কিছু জানল।

জব্বারের বলীখেলা

চট্টগ্রামের লালদিঘী ময়দানে প্রতিবছরের ১২ই বৈশাখ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় কুস্তি প্রতিযোগিতা। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় তা বলীখেলা নামে পরিচিত। ১৯০৯ সালে এই বলীখেলার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন চট্টগ্রাম নগরের বদরপাতি এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী প্রয়াত আবদুল জব্বার সওদাগর।

বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ এবং একই সঙ্গে বাঙালি যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব গড়ে তোলা ছিল এই বলীখেলার মূল উদ্দেশ্যে। জব্বার মিয়ার বলী খেলা ও বৈশাখী মেলা চট্টগ্রামের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও অহংকারে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে দেশের সবচেয়ে বড় লোকজ উৎসব হিসেবে এটিকে বিবেচনা করা হয়।

চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণের পর তারা এসে পৌঁছাল কর্ণফুলী নদীর পাড়ে। চট্টগ্রাম শহর, কর্ণফুলী নদী আর সাম্পান এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে যুগে যুগে কত গল্প, গান, লোকগাথা, নাটক, যাত্রা রচিত হয়েছে তা বলে শেষ করা যাবে না। চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের আঞ্চলিক লোক সংস্কৃতির একটি নান্দনিক দিক রচিত হয়েছে কর্ণফুলী নদীকে কেন্দ্র করে। কথাগুলো বলছিলেন ফাইজা আপু আর মেরি আপু।

তারা আরও বলেন চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানের সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। শ্যাম সুন্দর বৈষ্ণব এবং শেফালী ঘোষকে বলা হয় চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানের রাজা-রানী। তাছাড়া আস্কর আলী পন্ডিত, খায়েরুজ্জামান পন্ডিত, রমেশ শীল, আবদুল গফুর হালীসহ প্রমুখ শিল্পীরা তাঁদের রচনার মধ্য দিয়ে চট্টগ্রামের গানকে করেছেন সম্মৃদ্ধ। মাইজভান্ডারী গান ও কবিয়াল গান চট্টগ্রামের অন্যতম ঐতিহ্য। কবিয়াল রমেশ শীল এই ধারার একজন কিংবদন্তি শিল্পী ছিলেন। এইসব গানের মধ্যদিয়ে এই অঞ্চলের মানুষের সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্নাসহ সমগ্র জীবনযাত্রা ও সাংস্কৃতিক রূপ ফুটে উঠেছে।

চট্টগ্রামের মাইজভান্ডারী গানের মধ্য দিয়ে আধ্যত্মবাদ এবং মানবপ্রেমের রূপ ফুটে উঠেছে। চট্টগ্রাম কবিগানের জন্য উপমহাদেশে বিখ্যাত স্থান। নীতিকথা, মানবতা, রাজনীতি সবকিছু সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে ফুটে উঠেছে এই অঞ্চলের কবিগানে। এইভাবে চট্টগ্রামের আঞ্চলিকগান হয়ে উঠেছে এই অঞ্চলের মানুষের প্রাণের গান। মলয় ঘোষ দস্তিদার রচিত এবং শেফালী ঘোষের গাওয়া তেমনি একটি জনপ্রিয় আঞ্চলিক গান হলো—

'ছোড ছোড ঢেউ তুলি ফানি।।
লুসাই পাহাড়ত্তুন লামিয়ারে যার গৈ কর্ণফুলী।'

শেষ বিকেলের আলোতে কর্ণফুলী নদীটাকে দেখাচ্ছে অপূর্ব। অনেক জাহাজ আর সাম্পান ভেসে বেড়াচ্ছে নদীর বুকে। একপাশে হালকা ভাবে দেখা যাচ্ছে শাহ আমানত সেতু আর অন্যপাশে নদীর মোহনায় চট্টগ্রাম বন্দরের অংশবিশেষ। চট্টগ্রাম বন্দরের দিকে দেখিয়ে ফাইজা আপু বললেন এই সেই চট্টগ্রাম বন্দর যেখানে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি নৌ-কমান্ডোরা পরিচালিত করেছিল অপারেশন জ্যাকপট। অপারেশন জ্যাকপট বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি নৌ-কমান্ডোদের এক বিশাল সফলতার নাম। এটি ছিল একটি আত্মঘাতী গেরিলা অপারেশন। ১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট নৌ-কমান্ডোদের দ্বারা পরিচালিত প্রথম অভিযানটি 'অপারেশন জ্যাকপট' নামে পরিচিত। এদিন রাতে নৌ-কমান্ডোরা একযোগে চট্টগ্রাম, মংলা, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ বন্দর আক্রমণ করে এবং পাকিস্তান বাহিনীর ২৬ টি পণ্য ও সমরাস্ত্রবাহী জাহাজ ও গানবোট ডুবিয়ে দেয়। এই অপারেশন হানাদারদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। 'অপারেশন জ্যাকপট' সাড়া ফেলে দিয়েছিল গোটা পৃথিবী জুড়ে। মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবের এই ইতিহাস শুনছিল পঞ্চরত্ন।

পশ্চিম আকাশটাকে রক্তিম করে দিয়ে দিনের শেষ সূর্যটা ডুবে গেল। আকাশ দ্রুত তার বন্ধুখাতায় কর্ণফুলী নদীর সে মায়াবী দৃশ্যটির একটা খসড়া এঁকে রাখার চেষ্টা করল। কর্ণফুলী নদীর জন্য বুকভরা ভালবাসা নিয়ে তারা সেদিনের মতো ঘরে ফিরে চলল। ঘরে ফেরার পথে মেরি আপু পঞ্চরত্নকে বললেন তোমাদেরকে চট্টগ্রামের লোক সংগীতের একজন শিল্পীর কথা বলি। যিনি তাঁর ঢোল বাদনের জন্য সমগ্র দেশে বিখ্যাত ছিলেন তিনি হলেন বিনয় বাঁশি জলদাস।

বিনয় বাঁশি জলদাস। নামে তাঁর বাঁশি থাকলেও তিনি কিন্তু বাজাতেন ঢোল। ঢোল বাংলার নিজস্ব তাল বাদ্যযন্ত্র। আবহমান কাল ধরে বাংলার লোকজ সংস্কৃতির সাথে ঢোলের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবে ঢোলের ব্যবহার আজও প্রচলিত আছে। বাংলাদেশে প্রবাদ প্রতিম ঢোলবাদক হলেন বিনয় বাঁশি, তাঁর জন্ম ১৯১১ সালে বোয়ালখালী উপজেলার পূর্ব গোমদণ্ডী গ্রামে। ছোটবেলা থেকেই তিনি পারিবারিক পেশা ঢোল বাজানোর তালিম নেন। ঢোল বাদনের হাতেখড়ি তাঁর বাবা উপেন্দ্রলাল জলদাসের কাছে। ছেলেবেলাতে তিনি যাত্রার গানের প্রতি আকৃষ্ট হন। তরুণ বয়স থেকেই বিভিন্ন সময়ে তিনি যাত্রাদলে, ঘেটু গানের দলে, কীর্তন, শরীয়তি, মারফতি গানের দলের সাথে যুক্ত হন। তিনি ঢাকি নৃত্যশিল্পী হিসেবে দক্ষতা লাভ করেন। এক যাত্রাদলে কাজ করার সময় তাঁর পরিচয় হয় উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ কবিয়াল রমেশ শীলের সাথে। বিনয় বাঁশির ঢোল বাদন শুনে রমেশ শীল তাঁকে নিজ দলে নিয়ে নেন। দীর্ঘ ৩৫ বছর রমেশ শীলের দলে কখনও দোহার কখনও ঢুলি হয়ে বিনয় বাঁশী যুক্ত ছিলেন। রমেশ শীলের শেষ দিন পর্যন্ত বিনয় বাঁশী তাঁর দলের প্রধান বায়েন ছিলেন। ঢাকার কার্জন হলের সাংস্কৃতিক সম্মেলন, কলকাতার মহাম্মদ আলী পার্কের বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লার নিখিল বঙ্গ সাংস্কৃতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে উদয় শংকর, শেখ গুমানি, আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সলিল চৌধুরী, অন্নদাশংকর রায় প্রমুখ গুণী মানুষের সান্নিধ্যে আসেন। ১৯৪৪ সালে নৃত্যচার্য উদয় শংকরের দলে কিছুদিন কাজ করেন। বিনয় বাঁশি তাঁর সারা জীবন কাটান ঢোল বাজিয়ে, ঢোল বাদনের শৈলিকে তিনি নিয়ে যান অনন্য মাত্রায়। যন্ত্রসংগীতে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য ২০০১ সালে তিনি ২১শে পদকে ভূষিত হন। ২০০২ সালে তিনি মারা যান।

পরের দিন তারা মেরি আপুর সাথে রাঙ্গামাটির উদ্দেশে রওনা দিল। বাসে যেতে যেতে মেরি আপু তাদের জানাল বাংলাদেশের তিনটি জেলা নিয়ে পার্বত্য অঞ্চল গঠিত। জেলাগুলো হলো- রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান।

এই তিনটি জেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও জাতিসত্তাসমূহের মধ্যে রয়েছে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, লুসাই, বোম, পাংখো, খুমি, চাক, খেয়াং প্রভৃতি। তাছাড়া এই অঞ্চলে বাঙালি জনগোষ্ঠীও বসবাস করে। পাহাড়ে বসবাসকারী প্রতিটি জনগোষ্ঠী তাদের নিজ নিজ ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, ঐতিহ্য বজায় রেখে যুগ যুগ ধরে একে অপরের পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। সবুজ পাহাড়ে বসবাসকারী এই সকল মানুষের বর্ণিল সংস্কৃতি আমাদের দেশের সংস্কৃতিকে করেছে সমৃদ্ধ।

এরমধ্যে আকাশ মেরি আপুকে জিজ্ঞাসা করল শুনেছি তাঁতশিল্পে পার্বত্য জেলার বুনন শিল্পীদের রয়েছে নিজস্ব ঐতিহ্য ও করণকৌশল? মেরি আপু বললেন তুমি ঠিক শুনেছ। আমরা প্রথমে রাঙ্গামাটির যে এলাকায় যাব তা পাহাড়ি তাঁতশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। রাঙ্গামাটির লেকের চমৎকার দৃশ্য দেখতে দেখতে তারা চলে এলো আসাম বস্তি নামক জায়গায়। এইখানে তারা তাঁতের শিল্পের কারখানা, বুননসহ সব কিছু দেখল। এই এলাকায় রয়েছে অনেক বিক্রয় কেন্দ্র। সেগুলোও তারা ভাল করে দেখল এবং ডিজাইনগুলো এঁকে নিল বন্ধুখাতায়। চেক, স্ট্রাইপ এর সাথে চমৎকার মোটিফের ব্যবহার এই এলাকার বুননকে করেছে আলাদা। এই এলাকার স্থানীয় বুনন শিল্পীরা মূলত কোমর তাঁতে কাপড় বুনে। পঞ্চরত্ন বলল শতরঞ্জি বুনতে আমরা দেখেছিলাম গর্ত তাঁতের ব্যবহার এখানে দেখছি কোমর তাঁতের ব্যবহার। মেরি আপু বললেন এই এলাকের কিছু মানুষ এখনও নিজেরা তুলা থেকে সুতা তৈরি করে প্রাকৃতিকভাবে তা রং করে কাপড় তৈরি করে। প্রাকৃতিকভাবে রং করাকে ইংরেজিতে বলা হয় (organic dye) যা কিনা বর্তমান বিশ্বে খুবই সমাদৃত।

কোমর তাঁত

কোমর তাঁতে বুনা কাপড়ের নকশা

সেখান থেকে তারা গেল রাঙ্গামাটি শহরের ভেদভেদি নামক স্থানে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট ও জাদুঘরটি দেখতে। এখানে তারা পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সমূহের ঐতিহ্য এবং কৃষ্টি-সংস্কৃতির বিভিন্ন নিদর্শন দেখে মুগ্ধ হলো। এরপর তারা আমন্ত্রিত অথিতি হিসেবে মেরি আপুর বাসায় তঞ্চদের ঐতিহ্যবাহী খাবার খেল। সেখানে মেরি আপুর বাবা বললেন আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে আছে জুম চাষ এবং তাকে কেন্দ্রকরে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি। তাই আমাদের নাচ, গানসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাজে জুমের বিষয়টি ফুটে ওঠে। তিনি আরও বললেন আমরা পাহাড়ে বর্ষবিদায় এবং বর্ষবরণকে কেন্দ্র করে উৎসবের আয়োজন করি। বিজু, বৈসু, সাংগ্রাইন, চাঃক্রান পোই সহ প্রভৃতি উৎসবের মধ্য দিয়ে আমরা নতুন বছরকে বরণ করি। তাছাড়া পাহাড়ে বসবাসকরা প্রত্যেকটি জাতিগোষ্ঠীর রয়েছে নিজস্ব ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যা আমাদের বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে করেছে বৈচিত্রময় ও সমৃদ্ধ। এরপর মেরি আপুর ছোটবোন তাদেরকে ঐতিহ্যবাহী তঞ্চঙ্গা নাচের ভঙ্গিসহ একটা গান গেয়ে শুনালেন। সেখান থেকে তারা রাঙ্গামাটির ঝুলন্ত ব্রিজের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করে রাঙামাটি থেকে বিদায় নিল। ফিরে আসার সময় বাসের স্পিকারে বেজে উঠল মনিরুজ্জামান মনিরের লিখা, আলাউদ্দিন আলীর সুর করা আর নিয়াজ মোহাম্মদ চৌধুরী গাওয়া গান—

রাঙ্গামাটির রঙে চোখ জুড়ালো
সাম্পান মাঝির গানে মন ভরালো
রূপের মধু সুরের জাদু কোন সে দেশে
মায়াবতী মধুমতি বাংলাদেশে

রাঙ্গামাটি থেকে ফিরে এসে পরেরদিন ভোরে তারা যাত্রা করল পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারের উদ্দেশ্য। সেখানে পৌঁছে সমুদ্র সৈকতে যাওয়ার পথে তাদের চোখে পড়ল সারি সারি দোকান। এইসব দোকানে বিক্রি হচ্ছে হরেক রকমের শামুক-ঝিনুকে তৈরি করা হস্তশিল্প সামগ্রী। গৃহসজ্জার সামগ্রী থেকে শুরু করে কলমদানি, ল্যাম্পশেড, নানারকমের খেলনা, চাবির রিংসহ নানা রকমের গহনা। ছোট বড় বিভিন্ন আকৃতি আর রঙের শামুক-ঝিনুক কেটে জোড়া লাগিয়ে এইসব হস্ত ও কুটিরশিল্প সামগ্রীগুলো তৈরি করা হয়েছে। এসব শিল্পসামগ্রী দেখতে দেখতে অবনী বলল আমরা ফিরে গিয়ে গহনা তৈরির একটা উদ্যোগ নিতে পারি। আকাশ বলল কিভাবে হবে সেটা? অবনী বলল-

এই পাঠে আমরা যা করব

আমাদের উদ্যোগটির নাম হবে ‘গয়না-মালা বানাই’। কাজটি আমরা দলগতভাবে করব। এই কাজটি করতে অনেক কিছুর প্রয়োজন হবে না শুধু একটু বুদ্ধি খাটাতে হবে। প্রথমে খুঁজে বের করতে হবে বাড়িতে পরে থাকা অপ্রয়োজনীয় কাপড়, দড়ি, মোটা কাগজ। মোটা কাগজ আমরা পুরান খাতার মলাট/ মিষ্টির প্যাকেট থেকে সংগ্রহ করতে পারি।

- কাগজটিকে পছন্দমতো লকেট/center pice আকৃতিতে কেটে নেব।
- লকেট আকৃতির কাগজটি কাপড় দিয়ে মুড়ে সেলাই করে নিতে হবে, চাইলে আমরা নিখুঁতভাবে আঠা দিয়েও কাপড়টা কগজের উপর লাগাতে পারি।
- কাগজের উপর কাপড়টি লাগানো শেষ হলে লকেটটির উপরে রং দিয়ে বিভিন্ন রকমের নকশা করতে পারি। তাছাড়া বিভিন্ন সহজলভ্য প্রাকৃতিক জিনিস যেমন- শুকনো পাতা, ফুল, বিভিন্ন রঙের বীজ, কড়ি,

ঝিনুক ইত্যাদি আঠা দিয়ে লাগিয়ে নকশা করতে পারি। কেউ চাইলে চুমকি/পুতি/আয়না ও লাগাতে পারি।

- এবার লকেটটি ঝুলানোর জন্য দুইপাশে কাপড়ের ফিতা লাগাতে হবে। ফিতাটিও আগে সেলাই করে নিতে হবে। চাইলে কাপড়ের ফিতার পরিবর্তে বিভিন্ন রঙের সুতাকে বেনির মতো পাকিয়ে তার সাথে লকেটটি জুড়ে দিতে পারি।

এসব পরিকল্পনা করতে করতে তারা সমুদ্র সৈকতে এসে পৌঁছাল। সমুদ্রের ঢেউ যেন ছন্দ তুলে তাদেরকে বরণ করে নিল। সমুদ্রের শব্দ যেন বারবার ফিরে এসে সুরের মূর্ছনা তৈরি করছে। অবনী বলল প্রকৃতি যেন এক একটি স্বর মিলিয়ে মিলিয়ে সুরের মালা গাঁথছে। সমীর বলল স্বর দিয়ে সুরের মালা তৈরি করতে কিন্তু সাতটি শুদ্ধ স্বরের সাথে পাঁচটি কোমল ও কড়ি স্বরও প্রয়োজন হয়। স, র, গ, ম, প, ধ, ন এই সাতটি স্বরকে বলা হয় শুদ্ধ স্বর। তবে র, গ, ধ, এবং ন এই চারটি স্বরের সাথে আরও একটি করে কোমল স্বর রয়েছে। কোমল স্বরগুলো লেখারও নিয়ম রয়েছে। যেমন- র কে লেখা হয়- ঋ, গ কে- জ্ঞ, ধ কে দ, ন কে ণ। এই চারটি স্বর ছাড়াও ‘ম’ স্বরের সাথে একটি সহস্বর আছে যাকে বলা হয় ‘কড়ি’ স্বর। শুদ্ধ ম স্বরের থেকে এই স্বরটির অবস্থান একটু চড়া বা উপরে হওয়ার কারণে এটিকে কড়ি ম বলা হয়। তখন ম স্বরকে লেখা হয় হ্ম এর মতো। শুদ্ধ স্বরে যেভাবে আরোহন এবং অবরোহন করা হয়, ঠিক একইভাবে কোমল কিংবা কড়ি স্বরেও আরোহন অবরোহন চর্চা করতে হয়। যেমন-

ঋ- স্বরের ব্যবহারে সারগাম চর্চা

আরোহন- স ঋ গ ম প ধ ন র্স

অবরোহন- র্স ন ধ প ম গ ঋ স

এভাবে সাতটি শুদ্ধ স্বরের সাথে পাঁচটি কোমল ও কড়ি স্বর মোট বারটি স্বর মিলিয়ে তৈরি হয় সুরের মালা। অবনী বলল শামুক-ঝিনুকের মালা থেকে সুরের মালা কেমন যেন সবকিছু মিলেমিশে এক হয়ে গেল। আকাশ বলল বাংলাদেশের মানচিত্রের সবচেয়ে উপরের অংশের সাথে সবচেয়ে নিচের অংশের মালা গাঁথাটা আজকে আমারা সম্পন্ন করলাম। নদীমাতৃক এই দেশের আটটি নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আটটি জনপদের শিল্প ও সংস্কৃতির মুক্তা দিয়ে আমরা যে মালা রচনা করেছি তাঁর নাম বাংলাদেশ। সমুদ্রসৈকতে কিছু নবীন শিল্পীদের গাওয়া গানের সুর বাতাসে ভেসে আসছিল। মলয় ঘোষ দস্তিদারের লিখা চট্টগ্রামের জনপ্রিয় সে আঞ্চলিক গানের কথাটি পঞ্চরত্নের মনের কথার সাথে মিলে গেল—

বাংলাদেশের যতো কবি
শিল্পী গায়ক আছে...
শুভেচ্ছা জানাই আঁরা
অক্কুল গুনর হাছে

চাটগাঁইয়া হতাত সুরে
গান হুনাই গেলাম...

দইজ্যার কুলত বসত গরি
সিনা দি ঠেগাই ঝড় তুয়ান।

ও ভাই আঁরা চাটগাঁইয়া নওজোয়ান

এই অধ্যায়ে আমরা যা করব–

- এই অধ্যায়ে দেওয়া গয়না-মালা বানাই কাজটি প্রত্যেকটি ধাপ সম্পন্ন করে নিজেদের ইচ্ছামত গয়না-মালা তৈরি করব।
- ঋ- স্বরের ব্যবহারে সারগাম চর্চাটি যথাযথ ভাবে করব।
- চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব।
- পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বিভিন্ন ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠীর মানুষের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানব।
- ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি নৌ-কমান্ডোদের দ্বারা পরিচালিত অপারেশন জ্যাকপট সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব।
- শিক্ষকের সহায়তা নিয়ে ক্লাসের সব বন্ধুরা একত্রিত হয়ে একদিন আউটডোর করব। সেদিন খোলা স্থানে নিজেদের মতো করে ছবি আঁকব, গান করব, নাচ, অভিনয়সহ শিল্পকলার যেকোন শাখায় ইচ্ছেমতো মনেরভাব প্রকাশ করব।
- বিনয় বাঁশি জলদাস এর জীবন ও কর্মসম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব।

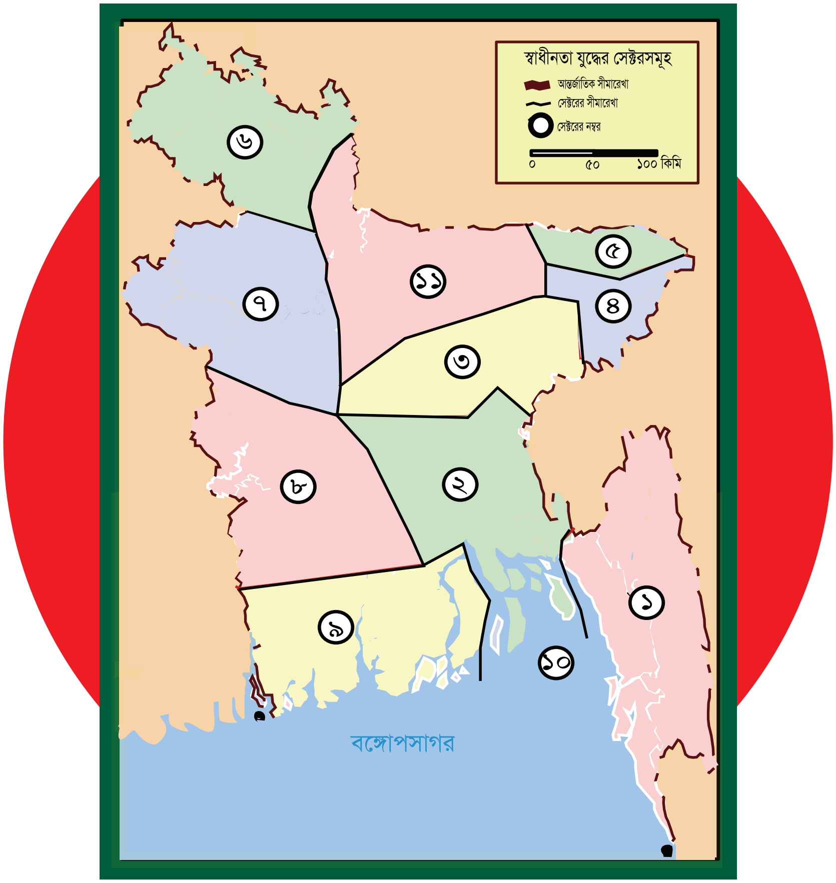

মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টর

১ নং সেক্টর– চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালী জেলার পূর্বাঞ্চল, ২ নং সেক্টর– নোয়াখালীর অংশবিশেষ, কুমিল্লার অংশবিশেষ, আখাউড়া, ভৈরব এবং ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ, ৩ নং সেক্টর– কুমিল্লার অংশবিশেষ, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও ঢাকার অংশবিশেষ, ৪ নং সেক্টর– সিলেটের পূর্বাঞ্চল, ৫ নং সেক্টর– সিলেটের পশ্চিমাঞ্চল, ৬ নং সেক্টর– রংপুর ও ঠাকুরগাঁও, ৭ নং সেক্টর– রাজশাহী ও দিনাজপুরের অংশবিশেষ, ৮ নং সেক্টর– কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর ও খুলনার অংশবিশেষ, ৯ নং সেক্টর– সাতক্ষীরা ও খুলনার অংশবিশেষ, বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা, ১০ নং সেক্টর– নৌ সেক্টর অর্থাৎ সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল ও অভ্যন্তরীণ নৌ পথ, ১১ নং সেক্টর– ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল ।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের রণকৌশল হিসেবে সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টর ও ৬৪টি সাব সেক্টরে ভাগ করা হয়। প্রতিটি সেক্টরের নেতৃত্বে ছিলেন একজন সেক্টর কমান্ডার। কমান্ডারদের সফল নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে মুক্ত হয় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল। এভাবে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জিত হয়। বিভিন্ন সেক্টরের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি যুদ্ধের মধ্যে রয়েছে- কামালপুর যুদ্ধ, বিলোনিয়ার যুদ্ধ, ভাটিয়াপাড়ার যুদ্ধ, রাধানগর যুদ্ধ।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল অষ্টম শ্রেণি

শিল্প ও সংস্কৃতি

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন করো

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ক্ষমা প্রদর্শন মহৎ গুণ

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার **১০৯** নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য